নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Ability Enhancement Course)

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা

কোর্স কোড : 5AE-BG-01

মডিউল : ১, ২

Module : 1, 2

<table>
<tr><th>কোর্স
বাংলা স্নাতক পাঠক্রম
(Ability
Enhancemen
Course)</th><th>কোর্স লেখক
Course Writer</th><th>কোর্স সম্পাদক
Course Editor</th></tr>
<tr><td>মডিউল : ১

Module : 1</td><td>শ্রীমতী বাণীমঞ্জরী দাস
ডঃ প্রতুলকুমার পণ্ডিত
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়</td><td rowspan="2">ডঃ অনামিকা দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ প্রতুলকুমার পণ্ডিত
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়</td></tr>
<tr><td>মডিউল : ২
Module : 2</td><td>শ্রীমতী বাণীমঞ্জরী দাস
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়</td></tr>
</table>

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Ability Enhancement Course)

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা

কোর্স কোড : 5AE-BG-01

মডিউল-১ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য)

একক-১ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 9 – 20

একক-২ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) 21 – 28

একক-৩ ❑ ধ্বনি, বাংলা লিপি 29 – 39

একক-৪ ❑ সন্ধি, ণত্ব-ষত্ব বিধি, বাক্য সংকোচন, বাক্য গঠন, সাধু ও চলিত ভাষা 40 – 61

মডিউল-২ (বাংলা সাহিত্য : নির্বাচিত পাঠ)

একক-১ ❑ কবিতা ঃ ভারততীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবার আসিব ফিরে—জীবনানন্দ দাশ 65 – 77

একক-২ ❑ প্রবন্ধ ঃ পতঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লাইব্রেরি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 78 – 88

একক-৩ ❑ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি—বর্তমান ভারত—বিবেকানন্দ তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু 89 – 104

একক-৪ ❑ বঙ্কুবাবুর বন্ধু—সত্যজিৎ রায় 105 – 116

মডিউল-১ ❑ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

একক -১ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ মূল পাঠ
  ১.৩.১ প্রাচীন যুগ
  ১.৩.২ মধ্যযুগ
১.৪ অনুশীলনী
১.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের রচনাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তিনটি যুগ—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। বর্তমান এককে তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। অল্প পরিসরে হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করা অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ	মধ্যযুগ	আধুনিক যুগ
(৯০০ থেকে ১২ খ্রিস্টাব্দ)	(১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)	(১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)

এই এককে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের কবিকুল এবং তাঁদের রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। খিঃ দশম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ। এই পর্বে সমাজ-কাঠামো জনজীবন কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। এই সময় কোনও সাহিত্য রচনার নিদর্শন মেলে না। সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে শূন্যতার যুগ বলা হয়।

খ্রিঃ ১৩৫০ থেকে ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য যুগ। এক হাজার বছর ব্যাপ্ত প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য আকার এবং বৈচিত্র্যে বিশাল। মধ্যযুগের এই সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাগে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী, চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী—চার শতাব্দী ধরে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিকে একটি অংশে সাজানো হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং অন্য শাখাগুলি, একত্রে গ্রথিত করে আলোচনা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য এবং মুসলমানি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য আলোচনায় শুধু কাহিনির উল্লেখ আছে। সবিস্তার আলোচনা করা হয়নি। বিখ্যাত কবিদের নামই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যুগসন্ধিক্ষণের কবি। মধ্যযুগের সমাপ্তি আর আধুনিক যুগের সূচনাকাল হল ইতিহাসে যুগসন্ধির পর্ব। সংক্ষেপে সেই সময়টির কথা বলা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার 'নবজাগরণের যুগ' বলা হয়। নবজাগরণ পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এই এককে। আধুনিক যুগের রচয়িতা, মনীষীদের নাম এবং তাঁদের প্রতিভার কথা উল্লেখ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষপর্ব ধরার চেষ্টা হয়েছে।

১.৩ মূলপাঠ

সাহিত্য সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে। বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সঙ্গে সমতা রেখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য তিনটি যুগে বিভাজিত—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

১.৩.১ প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ'। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়। নেপাল রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুথি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গীতিকবিতার নাতিদীর্ঘ কাঠামোয় চর্যাপদ লেখা হয়। ৪৬টি পদ বা কবিতা সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গ্রন্থের নামকরণ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ২৪ জন পদকর্তার নাম-পরিচয় মিলেছে। উল্লেখযোগ্য পদকর্তারা হলেন—লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, সরহপাদ প্রমুখ।

সহজিয়া মতবাদ ও সাধনপদ্ধতি হল চর্যাপদের মর্মবস্তু। চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র, নির্বাণ বা মুক্তিলাভ এবং বৌদ্ধদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্ব আড়াল করে লৌকিক জীবনের কথাও বলা হয়েছে।

ফলে ভাষায় এসেছে সাংকেতিকতা। চর্যার ভাষাকে তাই 'সন্ধ্যা ভাষা' অর্থাৎ আলো-আঁধারি ভাষা বলা হয়। চর্যাপদে নিম্নবর্ণের মানুষের আচার-আচরণ, জীবিকা-নির্বাহ, জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমনারী, অরণ্যাচারী শবর-শবরী, নৌ-নির্মাতা, গৃহনির্মাতা এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের উল্লেখ আছে। এছাড়া কৃষিকাজ, শিকার এবং অন্যান্য পেশার ছবিও এতে পাওয়া যায়।

কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্ব অর্থাৎ সাধনকথা মুখ্য হলেও চর্যাপদে হাজার বছর আগের বাংলার সমাজজীবনের পরিচয় মেলে।

১.৩.২ মধ্য যুগ

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত (খ্রিস্টাব্দ ১২০০-১৩৫০) বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন মেলে না। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙালিজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। অস্থির সময়ে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি হয় না। বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শো বছর বন্ধ্যাত্ব পর্ব চলেছিল। এই পর্যায়ে লিখিত সাহিত্যের নমুনা মেলেনি। প্রাচীন যুগের সমাপ্তি এবং মধ্য যুগের সূচনাকাল তাই অন্ধকারময় শূন্যতার যুগ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—বাংলা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে অবস্থিত শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করতেন। গৌড়েশ্বরের প্রদত্ত প্রশংসা তাঁকে রামায়ণ অনুবাদে অনুপ্রেরণা যোগায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বাঙালির গৃহধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্মীকির রামায়ণের সীতা তাঁর হাতে বাঙালি কুলবধূ হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে অনেক কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করেননি।

বাল্মীকি রামায়ণের মতো ব্যাসদেবের মহাভারতও অনূদিত হয়েছে। বাংলায় মহাভারতের প্রধান অনুবাদকের নাম কাশীরাম দাস। অনুমান করা হয়, সপ্তদশ শতকের (১৬০২-১৬১০ খ্রিস্টাব্দে) প্রথম দশকে তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। বর্ধমান জেলা নিবাসী কাশীরাম দাস বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের মতো বিশাল কাহিনি, উচ্চতর জীবনের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা—এ সবই কাশীরামের অনুবাদে সহজ প্রচেষ্টায় উঠে এসেছে। মহাভারতের অনুবাদ রামায়ণের মতো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে কাশীরামের অনুবাদ অনুসরণ করে কয়েকজন কবির মহাভারত অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালাধর বসু মধ্য যুগে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’।ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। গৌড়েশ্বর কবিকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদটি যেন বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণবসমাজে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে কাব্যটির সার্থকতা আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখ খুলে গেলেও জোয়ার আসে আরও কিছুদিন পরে। সে-জোয়ারে বাঙালি জীবনে এল নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। প্রেরণাদাতা ছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব যে নতুন প্রেমধর্মের আদর্শ প্রচার করলেন, তার প্রভাবে সমসাময়িক মৃতপ্রায় বাঙালি নিজের মহিমায় জেগে উঠল।

চৈতন্যদেব ইংরেজি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেবের মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সাধারণ হিসাবে আটচল্লিশ বছর তাঁর জীবন। স্বল্পায়ু জীবনের অর্ধেক নবদ্বীপে, বাকি অর্ধেক জীবন কাটে নীলাচলে। শেষ আঠারো বছর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তারপর তাঁর দেহে-মনে এক প্রেমভক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে তিনি সচেষ্ট হলেন। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার পরে তাঁর ভক্তিভাবাবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের সর্বোত্তম প্রকাশ হল মানুষ। মানুষই আবার দেবতাকে গড়ে তুলছে। সুতরাং ‘কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ।’ এভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অতীত থেকে টেনে এনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালির চিন্তাধারাকে আধুনিক খাতে তিনি বইয়ে দিলেন। তবে চৈতন্য-প্রবর্তিত দৃষ্টিকোণই বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিচার্য নয়। তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন।

চৈতন্যদেবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচয়িতা কিছু কবির পরিচয় আমরা পাই। এর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্য যুগের সূচনায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি কাব্য রচিত হয়। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ‘বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ’ বড়ু চণ্ডীদাসের ওই প্রাচীন পুথিটি আবিষ্কার করে সম্পাদনা করেন। পুঁথির নামকরণ করেন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। সহজ-সরল ভাষায় নাটকীয়ভাবে কৃষ্ণ-রাধা-বড়ায়ি প্রমুখ চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে রচিত তাঁর কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ সমাদর পেয়েছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এই দুজন কবির কাব্যের বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং চৈতন্যপূর্ব যুগে বৈষ্ণব পদাবলির একটি বিশেষ ধারা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কেউই বৈষ্ণবধর্মে

দীক্ষিত নন, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান আছে। তার প্রধান কারণ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। উভয় কবির রচনার বিষয় এক হলেও ভাব ও প্রকাশে পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস সহজ, সরল প্রাণের কবি। তাঁর অঙ্কিত রাধা গভীর মনের কথা সহজ ভাষায় ব্যস্ত করেছে। বিদ্যাপতির রাধা তুলনামূলকভাবে চঞ্চলপ্রাণা, দু'জনের ভাষাশৈলীও আলাদা। ভাষার ক্ষেত্রে দুই কবির স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। ভাষার জন্যই রাধা চরিত্রটি দু'জন কবির কাছে দু'রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মহাভাবে আশ্রিত চৈতন্যদেবকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে যাঁরা পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিগণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর যাঁরা পদ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস, যাদবেন্দ্র, ঘনরাম দাস উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শুধু কবি, ভক্ত নন। তাঁদের লেখায় তত্ত্ব নেই। তত্ত্ব বলতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যা বুঝিয়েছেন, তা হল প্রিয়তমকে কান্তভাবে বা ভগবানরূপে উপাসনা করা হল ধর্মের শেষ কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রেম তাঁদের কাছে তত্ত্ব হয়ে উঠল। লৌকিক জীবন বা নায়ক-নায়িকার প্রেম সম্পর্ক, মা-সন্তানের বাৎসল্য সম্পর্ক রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে কবিরা পদ রচনা করেছেন। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'—গ্রন্থ দুটিতে বৈষ্ণবতত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে পদকর্তারা পদ রচনা করতেন। রসতত্ত্ব নির্দেশিকায় পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর ইত্যাদির সংজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পদাবলি সাহিত্য ছাড়া এই সময়ে সাহিত্যের আরেকটি দিক লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচলের লীলা নিয়ে চরিত্রসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আদি দুই জীবনীকার মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদর দু'জনেই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে জীবনীকাব্য লিখেছেন। চৈতন্যপার্ষদ মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' বা মুরারি গুপ্তের কড়চা সংস্কৃতে লেখা প্রথম জীবনীকাব্য। স্বরূপ দামোদরের কড়চাও সংস্কৃতে লেখা। জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' উৎকৃষ্ট জীবনীকাব্য। পরবর্তীকালে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু কবি বাংলায় চরিত-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা করার সময়ে পদকর্তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত'—শ্রীগৌরাঙ্গ অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রেমময় মুখ। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের দিব্যজীবনকে যাঁরা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবি। রাধাভাবে-ভাবিত চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ আরাধনা লক্ষ করে পদকর্তারা যেসব গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ লিখেছেন, সেগুলিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়ে থাকে। 'গৌরচন্দ্রিকা' অর্থ হল ভূমিকা। পালা শুরু করার আগে কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে বুঝিয়ে দেন যে, এরপর রাধা-কৃষ্ণের কোন্ বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। এছাড়া বাল্যলীলার গৌরাঙ্গপদও আছে। সেগুলি অবশ্য রাধাভাবে-ভাবিত

নয়। তাই গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। জীবনী-সাহিত্য ও পদাবলি-সাহিত্য নিয়েই সুসমৃদ্ধ ছিল ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলগান সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকারে রচিত হয়ে প্রচার লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই আখ্যানকাব্যগুলি 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

'মঙ্গল' কথাটির অর্থ 'কল্যাণ', অর্থাৎ গৃহকল্যাণ-বিষয়ক রচনাকে 'মঙ্গলকাব্য' বলে। 'মঙ্গলকাব্য' দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি। তাঁরাই প্রধান চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা হল মনসাদেবীকে নিয়ে 'মনসামঙ্গল', চণ্ডীদেবীকে নিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল', ধর্মঠাকুরকে নিয়ে 'ধর্মমঙ্গল'। মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মনসামঙ্গল কাব্য, ষোড়শ শতাব্দী থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে শুরু হয়। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামে মঙ্গল কাব্যের চতুর্থ একটি ধারা আছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল আট দিন ধরে এবং ধর্মমঙ্গল বারো দিন ধরে গাওয়া হয়ে থাকে।

মনসা পৌরাণিক দেবী। মনসা'র স্থান বৈদিক সাহিত্যে নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত মনসামঙ্গলের মূল বিষয় ঃ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। মনসার গীত প্রথম রচনা করেন বলে কানা হরিদত্ত-র নাম জানা যায়। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি। চৈতন্য সমসাময়িক মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণদেব এবং সপ্তদশ শতকে মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী নন, তিনি অভয়া বনদেবী। কাব্যে দুটি কাহিনি আছে— এক, আখেটিক খণ্ড, দুই, বণিক খণ্ড।

প্রথম খণ্ডে দেবী অরণ্যের পশুমাতা। ব্যাধের অত্যাচার থেকে পশুদের রক্ষার জন্য ব্যাধকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে বনভূমি পরিষ্কার করিয়ে রাজ্য স্থাপন করিয়েছিলেন এই দেবী। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি অরণ্যপালিকা। দুর্গত নারীকে অনুকম্পা দেখিয়ে, তাকে দিয়ে পূজা করিয়ে নিজের মহিমা প্রচার করেছেন তিনি।

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবির নাম মানিক দত্ত। তবে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রচারের আড়ালে কবিরা মানুষের জয়গান করেছেন। মঙ্গলকাব্য যেহেতু মধ্যযুগের সাহিত্য, স্বাভাবিকভাবে সেখানে দেবতা প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও কাব্যগুণে মঙ্গলকাব্য যথেষ্ট চমৎকারিত্ব রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষত্ব হল যে, কেবলমাত্র বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এর প্রচার সীমাবদ্ধ। এর কারণ বোধ করি, মনসা বা চণ্ডীর মতো ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য এত ব্যাপক নয়। একমাত্র ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধর্মপূজায় পৌরোহিত্য করার অধিকার পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত নারী। ধর্মমঙ্গলে পুরুষ দেবতা স্থান পেয়েছে। বীররসের প্রকাশ প্রথম পাওয়া যায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে। কাব্যকাহিনিতেও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিবরণে ঐতিহাসিক পটভূমির আভাস পাওয়া যায়। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী পার্বত্যগড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিয়ে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত।

কাব্যের আদিকবি হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন ময়ূরভট্ট। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কবির নাম খেলারাম চক্রবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া আরো কয়েকজনের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক এবং সীতারাম দাস উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় চেতনায় ধর্মের একটি বিশেষ স্থান ছিল। ফলে, সাহিত্য স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। বৈষ্ণব পদাবলি রোমান্টিক কাব্য হলেও ধর্মীয় তত্ত্ব বা দার্শনিকতা বহির্ভূত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ রচনায় দেবতা সম্পর্কে ভীতি যতটা আছে, ভক্তি ততটা নেই।

ধর্ম ও দেবতা বাদ দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি প্রেমগাথা রচিত হয়েছিল। রচয়িতারা মুসলমান কবি। তাঁদের কাব্যের শ্রোতা-পাঠক আরাকানের রাজা এবং রাজপুরুষ সম্প্রদায়। গোহারি দেশের রাজা লোরের সঙ্গে ময়নাবতীর বিবাহ হয়; কিন্তু চন্দ্রাণী নামে অপর নারীর সঙ্গে রাজা লোর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, বহু ক্লেশের পর উভয়ের মিলন হয়। প্রথম খণ্ড তাই 'লোরচন্দ্রাণী' নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় খণ্ডে, সতীময়নার বিরহের বর্ণনা-কাহিনির শেষে ময়নার কৌশলে চন্দ্রাণীকে নিয়ে তার কাছে লোর ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাহিনি দুটি দেবতাবিহীন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যের দুজন বড়ো কবি হিন্দিতে লেখা প্রণয় কাব্য ভাষান্তর করেন। 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যের রচয়িতা হলেন দৌলতকাজি। তিনি শক্তিশালী কবি ছিলেন। গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই দৌলতকাজির মৃত্যু হয়। দৌলতকাজির কাব্যরচনার আনুমানিক সময়কাল ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

আরাকান বা রোসাঙের রাজসভায় দৌলতকাজির পরে আসেন সৈয়দ আলাওল। তিনি ছিলেন সভার শ্রেষ্ঠ কবি। দৌলত কাজির অসমাপ্ত গ্রন্থ তিনি শেষ করেন। আলাওলের প্রধান কীর্তি 'পদ্মাবতী' কাব্য। তিনি আরো কয়েকটি কাব্য ও কিছু গান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্যদের নাম। নাথযোগীদের কাহিনি দুভাগে বিভক্ত। একটি সিদ্ধাদের কাহিনি, অপরটি মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনি।

প্রথম কাহিনির মূল বিষয় হল, শিষ্য গোরখনাথ কামিনী মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেছেন। কাহিনির নাম তাই মীনচেতন বা গোরখবিজয়। দ্বিতীয় কাহিনির বিষয় হল, রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। কাহিনির প্রধান আকর্ষণ হল রাজপুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণের অধ্যায়। ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন হলেন কাহিনিগুলির প্রধান কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ বাংলা সাহিত্যে 'যুগসন্ধিক্ষণ' নামে চিহ্নিত হয়েছে। মোগল শাসন অবলুপ্তির পথে পা দিয়েছে আর ইংরেজ আগমন সূচিত হচ্ছে, তাই যুগসন্ধি। ফলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, এমনই এক মুহূর্তে দু'জন বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটে।

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাহিনির কাঠামোতে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। এমনকি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে গঠন-বিন্যাসে মূল পরিবর্তন আনা হয়নি। রামপ্রসাদ মূলত শাক্তপদাবলি রচনার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আগমনী ও বিজয়া পর্বের পদ এবং ভক্তের আকুতি শীর্ষক পদগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে নবাবি শাসনের ব্যর্থতা, পশ্চিম তীরে বর্গিদের অবাধ লুণ্ঠন, বিদেশি জলদস্যুদের বাংলার উপকূল অঞ্চলের ফসল অপহরণ বাংলার সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবন দুর্বিসহ করে তোলে। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, রুচির অধঃপতন দুঃখ দুঃসহ দুর্দিনের কালোছায়া ফেলেছে। একদিকে দরিদ্র স্বামীর ঘরে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, অন্যদিকে কন্যার পিতৃগৃহে আসার আকুতি এবং জননীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। সংকটগ্রস্থ মানুষের আকুল প্রার্থনা 'আমার সন্তান যে থাকে দুধেভাতে' এই দুঃসময়ের প্রতিচ্ছবি।

যুগসন্ধির নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের মতো কবিদের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। যুগচেতনা, সমাজবোধ, ভক্তি ও সুগভীর আকুতি, দেবদেবীর বাস্তবায়ন, সর্বোপরি; ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে সমকালীন যুগচেতনা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মধ্যযুগে-প্রচলিত বাংলা সাহিত্যধারার পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারার সাহিত্য লিখিত সাহিত্য নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো গীতিকবিতা। তবে নগর- সংস্কৃতির পটভূমিতে এর জন্ম। নতুন যুগের এই সাহিত্যকে বলা হয় 'কবিগান'। সংস্কৃত 'কবি' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। এখানে কবিতা রচনাকারীদের 'কবিওয়ালা' বলা হয়েছে। জীবিকার তাগিদে তাঁরা কবিতা রচনা করতেন। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি রামবসু। ভোলা ময়রা, হরঠাকুর, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ বহু কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্পশিক্ষিত স্তর থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা, ফলে প্রাচীন আভিজাত্য ভাঙতে থাকে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নবাবি দ্বৈতশাসনের সুযোগে কিছু মানুষ নানাভাবে বিত্ত অর্জন করে নতুন নাগরিক সমাজ গড়ে তুলল। গঙ্গাতীরবর্তী কলিকাতা, চন্দননগর হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়। সমাজের একশ্রেণির নতুন নাগরিক মানুষদের মনোরঞ্জন করাই ছিল কবিওয়ালাদের গানরচনার উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট শিল্পরূপের বিকাশ তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

১.৪ অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৫টি উত্তর থেকে বেছে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ রচনা করেছেন—

(১) চৈতন্যদেব

(২) বিদ্যাপতি

(৩) রামপ্রসাদ

(৪) মালাধর বসু।

(খ) শাক্তপদাবলির রচয়িতা—

(১) রামপ্রসাদ সেন

(২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(৩) রূপরাম চক্রবর্তী

(৪) ভারতচন্দ্র

(৫) কাশীরাম দাস।

(গ) চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা—

(১) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(২) মুরারি গুপ্ত

(৩) কৃত্তিবাস

(৪) আলাওল

(৫) গোবিন্দদাস।

২। নীচের শূন্যস্থানগুলি ঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন :

(ক) মঙ্গলকাব্যের দেবতা প্রধানত ____________ ।

(খ) গৌড়েশ্বর মালাধর বসুকে ____________ উপাধি দিয়েছিলেন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হলেন ____________।

(ঘ) লোচনদাস ____________ রচনা করেছিলেন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৪টি উত্তর থেকে বেছে (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) চর্যাগীতির উদ্ভব—
(১) প্রাচীন যুগ
(২) মধ্য যুগ
(৩) আধুনিক যুগ
(৪) অন্ত্য-মধ্যযুগ।

(খ) চর্যাগীতির আবিষ্কারক—
(১) মালাধর বসু
(২) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
(৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়
(৪) বড়ু চণ্ডীদাস
(৫) রামপ্রসাদ।

(গ) বাংলা রামায়ণের অনুবাদক—
(১) তুলসীদাস
(২) কাশীরাম দাস
(৩) কৃত্তিবাস
(৪) মালাধর বসু
(৫) দ্বিজ চণ্ডীদাস।

(ঘ) মুরারি গুপ্ত রচিত জীবনীকাব্য—
(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত
(২) চৈতন্যচরিতামৃত
(৩) চৈতন্যমঙ্গল
(৪) উজ্জ্বলনীলমণি
(৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

৪। নীচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত স্থানে লিখুন :

(ক) মহাভারত	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
(খ) মনসামঙ্গল	রূপরাম
(গ) ধর্মমঙ্গল	কাশীরাম দাস
(ঘ) বৈষ্ণব পদাবলি	জ্ঞানদাস
(ঙ) সতীময়না	দৌলতকাজী।

রচয়িতা	**গ্রন্থ**
(ক) __________	__________
(খ) __________	__________
(গ) __________	__________
(ঘ) __________	__________
(ঙ) __________	__________

৫। নিম্নলিখিত রচয়িতাদের গ্রন্থগুলির নামকরণ কিছু শুদ্ধ এবং কিছু অশুদ্ধ দেওয়া আছে। কোন্‌টি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

	শুস্থ	**অসুস্থ**
(ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’।	☐	☐
(খ) কাশীরাম দাসের রচনা রামায়ণ।	☐	☐
(গ) বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।	☐	☐
(ঘ) শাক্তপদাবলি রামপ্রসাদের লেখা।	☐	☐
(ঙ) নাথ সাহিত্য লিখেছেন ফয়জুল্লা।	☐	☐
(চ) রূপরাম বিখ্যাত রচয়িতা ধর্মমঙ্গলের।	☐	☐
(ছ) ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ ভারতচন্দ্রের রচনা।	☐	☐
(জ) ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ মধুসূদন দত্তের রচনা।	☐	☐
(ঝ) ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বিদ্যাপতির রচনা।	☐	☐

৬। নীচের শূন্যস্থানগুলি ঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন :

(ক) ____________ থেকে চর্যাপদের আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি।

(খ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ____________ রচনা।

(গ) ____________ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।

(ঘ) গোবিন্দদাস একজন ____________ কবি ছিলেন।

(ঙ) ____________ সংস্কৃত 'কবি' অর্থে কবি নয়।

(চ) ____________ উনিশ শতকের গদ্য লেখক।

১.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন।

একক -২ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ আলোচনা (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)
২.৪ উপসংহার
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ সহায়ক গ্রন্থ

২.১ উদ্দেশ্য

আগের এককে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য।

২.২ প্রস্তাবনা

এখানে আমাদের আলোচ্য বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ আগেই আলোচিত হয়েছে। তা থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ধরা হয়ে থাকে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এদেশে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হবার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর বাঙালির উপর ইংরেজদের প্রভাব পড়তে শুরু করে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দৈনন্দিন জীবনেও সে-প্রভাব পড়তে থাকে। তার ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে বঙ্গদেশে। সেসব আমাদের আলোচ্য নয়, শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং তার ফলে রচিত সাহিত্যের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

আমরা আগেই দেখেছি, প্রাক্-আধুনিক যুগে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমস্ত রচনাই পদ্যে লেখা এবং দেবনির্ভর। আধুনিক যুগে দেবতা নির্ভরতার পরিবর্তে মানুষই মুখ্য হয়ে উঠল। আর শুধু পদ্য নয়, গদ্যও সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে দেখা দিল।

পাঠক্রমের স্বল্প পরিসরে সেই সব পরিবর্তনের পরিমণ্ডলে লিখিত প্রায় দুশো বছরের সাহিত্যের বিস্তারিত বর্ণনা বা পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, যথাসম্ভব সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৩ আলোচনা (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)

মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেন। তাঁদের পরে কিছুদিন তেমন কোনো

কবি বা কাব্য পাওয়া যায় না। এরপর ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করলে তাদের প্রভাব মানবজীবনের মতো সাহিত্যেও পড়ল। এতদিন মানুষের চেয়ে দেবদেবীই প্রধান ছিল। মানুষ ছিল গৌণ। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে দেবতার পরিবর্তে মানুষ হল প্রধান।

খ্রিস্টীয় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন ও বাংলা গদ্য চর্চা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনা। সাধারণভাবে বলা যায়, ঊনবিংশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু, যা চলছে আজ পর্যন্ত। আমরা সংক্ষেপে পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করি।

গদ্য-প্রবন্ধ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমে বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাত। একই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ও তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে গদ্যরীতির ব্যবহার করলেন। আবার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি) স্থাপনের পর বাঙালি তরুণদের ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হল। তার ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব দেখা দিল।

অধ্যক্ষ কেরী নিজে রচনা করেন 'ইতিহাসমালা' ও 'কথোপকথন'। তাঁর কলেজের অধ্যাপকদের নির্দেশ দেন গ্রন্থরচনার। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি', 'প্রবোধচন্দ্রিকা'।

এই সঙ্গেই আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল, সেই রাজা রামমোহন রায়ের উল্লেখ করব। তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে কলম ধরেন। তাঁর রচনাগুলি যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক এবং তার্কিক ভাষার উদাহরণ। তাঁর গদ্য রচনার রীতিই পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যের ভিত্তি প্রস্তর। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'উপনিষদের অনুবাদ', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব', 'পথ্যপ্রধান', 'ব্রাহ্মণসেবধি' প্রভৃতি। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' আমাদের বাংলা ব্যাকরণের ভিত্তি।

এই সঙ্গেই আমরা বাংলা প্রবন্ধের অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকারের প্রসঙ্গে আসি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের প্রথম 'যথার্থ শিল্পী' বলা হয়। তিনি বাংলা গদ্যে কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতির ব্যবহার করে গদ্যকে সরল ও সহজবোধ্য করে তুললেন। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বিধবা বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি।

অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্রাবন্ধিক। তিনিও বাংলা গদ্যের গঠনে ও শ্রীবৃদ্ধিতে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল—'ভূগোল', 'চারুপাঠ', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্মনীতি', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি।

উনিশ শতকে আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচনাগুলি হল—'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (২ খণ্ড—সকল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়) প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষে প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনায় 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত। তাঁর প্রবন্ধ রচনাগুলি হল—'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞান রহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি।

এরপর যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম করতে হয় তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ হল—'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজাপ্রজা', 'শিক্ষা', 'স্বদেশ', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট' প্রভৃতি।

রবীন্দ্র-সমকালীন অন্যান্য বিখ্যাত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল—'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'শব্দকথা' প্রভৃতি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে চলিতরীতির ব্যবহার শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—'তেল-নুন-লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা কথা', 'নানা চর্চা' প্রভৃতি।

বিশ শতকের আরেকজন কবি ও প্রাবন্ধিকের নাম মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'বঙ্কিমবরণ', 'সাহিত্য বিচার', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি।

এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, মহঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখর নাম বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য।

কাব্য-কবিতা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পদ্যে লেখা, আধুনিক পর্বে এসে গদ্যে সাহিত্য রচনার সূচনা হল। আগেই বলেছি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব হল দেবতা নির্ভরতার পরিবর্তে মানুষ, প্রকৃতি, দেশ-স্থান-কাল প্রাধান্য পেল।

এই সময় যাঁরা কবিতা রচনা করতেন, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুই যুগের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন। আঠারো শতকের চিন্তাভাবনা ও কলকাতায় বাস করে সাহেবি চালচলন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তাঁর রচনায় দুই যুগের ভাবধারার মিশ্রণ ঘটেছে। তিনি ঈশ্বরের বদলে পাঁঠা, মেমসাহেব, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া এই সব বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কবিতা লিখেছেন।

এই সময়ে আর একজন কবি বাংলা কাব্য জগতে নতুনত্বের সূচনা করেন। তিনি হলেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেশাত্মবোধমূলক কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনায় এই নতুন দিকের সূচনা।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবি মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে ব্যাপক এক পরিবর্তনের সূচনা করলেন। বাংলা ভাষায় 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পত্রকাব্য—এখানে নারীমুক্তির কথাই প্রকাশিত। এছাড়াও তিনি চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তন করেন। সব মিলিয়ে তাঁর কাব্যে আধুনিকতার সূচনা বলা যায়।

মধুসূদনের অনুসরণে বাংলায় মহাকাব্য রচনা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। হেমচন্দ্র রচিত মহাকাব্যের নাম—'বৃত্রসংহার'। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'। 'পলাশীর যুদ্ধ' নামে একটি আখ্যানকাব্যও রচনা করেন নবীনচন্দ্র সেন।

এই তিন কবির পর বাংলা মহাকাব্যধারা বন্ধ হয়ে যায়। আসে গীতিকাব্যের ধারা। এই গীতিকাব্যের সুর প্রথম শোনা যায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনায়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গীতিকাব্যে 'ভোরের পাখী' বলেছেন। বিহারীলালের কাব্যগুলি হল—'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি।

বিহারীলালের পর যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ', কিন্তু তাঁর নামে ছাপা নয়, নামের জায়গায় ছিল 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা'। স্বনামে মুদ্রিত প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। তাঁর শেষ কবিতা—'তোমার সৃষ্টির পথ'। এর মাঝে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখ করি—'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'বলাকা', 'গীতাঞ্জলি', 'প্রান্তিক', 'নবজাতক' প্রভৃতি।

এই সময় আরো অনেক কবি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁরা হলেন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমুদ্দিন, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি।

নাটক

এখন আমরা নাটক বলতে যা বুঝি, উনিশ শতকের আগে তা ছিল না। যাত্রাগান, পাঁচালী গান, নৃত্যগীত- প্রধান পালাগান প্রভৃতি এদেশে ছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ধরনে মঞ্চ তৈরী করে অভিনয় প্রদর্শন শুরু হয়। অনেকে নাট্য রচনায় হাত দেন। জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শিকদারের

'ভদ্রার্জুন' দুটি নাটকই ১৮৫২ সালে প্রকাশিত। সেই সময় রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। এছাড়াও তিনি অনেক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এইসব নাটক দেখে মধুসূদন দত্ত বাঙালির নাট্যচর্চা সম্পর্কে হতাশ হন। তখন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি লেখেন। তাঁর অন্যান্য নাটক হল—'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'।

মধুসূদনের সমকালে আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'নীল দর্পণ'। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলি হল—'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'সধবার একদশী' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। নাটকগুলি হল—'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'হঠাৎ নবাব', 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি।

তারপরই বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম করতে হয়। তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তাঁর কয়েকটি নাটক হল—'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'বিশ্বমঙ্গল', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আর যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক হল—'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি হল—'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা নাটকগুলি হল—'নন্দকুমার', 'আলমগীর', 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ', 'আলিবাবা' প্রভৃতি।

এছাড়াও বাংলা নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নাটক—মন্মথ রায়ের 'কারাগার', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', বনফুলের 'শ্রী মধুসূদন', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রভৃতি।

গল্প-উপন্যাস

বাংলায় গদ্যে লেখালেখি শুরু হওয়ার পরই গল্প-উপন্যাস রচনার উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাস হল ইংরাজির নভেল ও রোমান্সের বাংলা প্রতিশব্দ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গদ্য গল্পকথা লেখা শুরু হলেও সেগুলিকে উপন্যাস বলা যায় না। উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের

ঘরে দুলাল'-এ আছে বলে অনেকে মনে করলেও এটিকে প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস বলা যায় না। সব দিক বিচার করে বাংলায় প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'। বঙ্কিমচন্দ্র মোট ১৪টি উপন্যাস লেখেন— 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'রজনী', 'সীতারাম', 'যুগলাঙ্গুরায়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাধারানী'।

রবীন্দ্রনাথ-ও অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হল—'করুণা', 'বউঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়'।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তার লেখা উপন্যাস—'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী' প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তীকালে যেসব ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন—বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, মীর মশারফ হোসেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আখতারুজ্জান, ইলিয়াস, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ মজুমদার প্রভৃতি।

২.৪ উপসংহার

আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংরক্ষণ শেষ করলাম, কারণ পাঠক্রমের সীমিত পরিসরে বেশি লেখা সম্ভব নয়। আশাকরি শিক্ষার্থীরা এই পর্বের আলোচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

২.৫ অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর দিন :

(ক) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

(খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

(গ) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কবে থেকে ধরা হয়?

(ঘ) 'গোস্বামীর সহিত বিচার' কার লেখা?

(ঙ) 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?

(চ) বাংলা গদ্যের প্রথম 'যথার্থ শিল্পী' কাকে বলা হয়?

(ছ) বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত রচনাটির নাম লিখুন।

(জ) 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি কে লেখেন?

(ঝ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম লিখুন।

(ঞ) কাকে বাংলার 'সাহিত্য সম্রাট' বলা হয়?

(ট) 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ দুটি কার লেখা?

(ঠ) রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লিখুন।

(ড) 'তেল-নুন-লকড়ি'র লেখক কে?

(ঢ) 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কে রচনা করেন?

(ণ) মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যটির নাম লিখুন।

(ত) 'বৃত্রসংহার' কার লেখা?

(থ) 'পলাশীর যুদ্ধ' কে রচনা করেন?

(দ) মধুসূদন দত্ত-রচিত পত্রকাব্যটির নাম কী?

(ধ) বাংলা কাব্যে 'ভোরের পাখী' কাকে বলা হয়?

(ন) রবীন্দ্রনাথের নিজের-নামে-ছাপা প্রথম কবিতাটির নাম কী?

(প) রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা কোনটি?

(ফ) 'পুরুবিক্রম'-এর রচয়িতার নাম কী?

(ব) দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটকটির নাম লিখুন।

(ভ) গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুটি নাটকের নাম লিখুন।

(ম) 'দুর্গেশনন্দিনী' কার লেখা?

(য) 'শ্রীকান্ত' কে লেখেন?

(র) 'রক্তকরবী' কে রচনা করেন?

২। ঠিক উত্তরটিতে '✓' চিহ্ন দিন :

(ক) 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন—রামমোহন রায়/সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

(খ) 'কথোপকথন' রচনা করেন—উইলিয়াম কেরী/মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

(গ) বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রথম ব্যবহার করেন—প্রমথ চৌধুরী/রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) বাংলার প্রথম সনেট রচনা করেন—মধুসূদন/প্রমথ চৌধুরী।

(ঙ) 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' রচনা করেন—হেমচন্দ্র/নবীনচন্দ্র।

(চ) 'সারদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা—ভারতচন্দ্র/বিহারীলাল।

(ছ) 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের রচয়িতা—বিদ্যাসাগর/রামনারায়ণ তর্করত্ন।

(জ) 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটক দুটির প্রকাশকাল—১৮৫২/১৮৫৪।

(ঝ) 'নূরজাহান' নাটকটি রচনা করেন—ক্ষীরোদপ্রসাদ/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(ঞ) 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করেন—রবীন্দ্রনাথ/বঙ্কিমচন্দ্র।

(ট) 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি রচনা করেন—রবীন্দ্রনাথ/শরৎচন্দ্র।

(ঠ) 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন—শরৎচন্দ্র/প্যারীচাঁদ মিত্র।

(ড) 'আলিবাবা' ও 'আলমগীর' নাটক দুটি রচয়িতা—গিরিশচন্দ্র/ক্ষীরোদপ্রসাদ।

(ঢ) 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির রচয়িতা—জ্যোরিরিন্দ্র নাথ/মধুসূদন দত্ত।

২.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন।

একক -৩ ❑ ধ্বনিবিজ্ঞান : বাংলা ধ্বনির পরিচয়

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ মূলপাঠ-১

৩.৩.১ বাগ্‌যন্ত্র

৩.৩.২ বাংলা ভাষার ধ্বনি বর্ণ ও অক্ষর

৩.৪ সারাংশ-১

৩.৫ অনুশীলনী-১

৩.৬ মূলপাঠ-২

৩.৬.১ স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ

৩.৬.২ দ্বিস্বরধ্বনি আর অর্ধস্বরধ্বনি

৩.৬.৩ স্বরধ্বনির উচ্চারণ

৩.৬.৪ ব্যঞ্জনধ্বনি আর ব্যঞ্জনবর্ণ

৩.৬.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

৩.৬ সারাংশ-২

৩.৭ অনুশীলনী-২

৩.৮ বাংলা লিপি

৩.৯ অনুশীলনী-৩

৩.১০ সহায়ক গ্রন্থ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই কয়েকটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—

- বাগযন্ত্র ও স্বরধ্বনি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণি বর্ণনা করতে পারবেন।

- ভাষার প্রধান একক ধ্বনিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।
- বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

যে-কোনো ভাষাই যদি শোনা যায়, তাহলে প্রথমে মনে হবে বেশ কিছু ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে। যে-কোনো ভাষারই প্রাথমিক একক হচ্ছে এই ধ্বনি। বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে। সংস্কৃত বর্ণমালা অনেক আগেই ধ্বনিগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজিয়ে রেখেছিল, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেকটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা সাজানো হয়েছিল। এই আলোচনা পড়লে বাংলা ভাষার ধ্বনি-সম্পর্কিত প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবেন এবং ধ্বনির ঠিক প্রয়োগে সক্ষম হবেন।

৩.৩ মূলপাঠ-১

ধ্বনিবিজ্ঞানের এই এককে আমরা আলোচনা করব—ধ্বনির উৎপত্তি কী করে হয়, বাংলা ভাষায় কথা বলতে গিয়ে আমাদের কী কী ধ্বনির উচ্চারণ করতে হয়, নানা ধ্বনির নানা উচ্চারণে কথা বলার যন্ত্রের বা বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে—ইত্যাদি। এককের ১ম অংশে আমরা প্রথমে বাগ্‌যন্ত্রটাকে চিনে নেবার চেষ্টা করি এবং তারপর বুঝে নিই, বাংলা ভাষায় ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর—এদের পার্থক্য কী?

৩.৩.১ বাগযন্ত্র

অন্য প্রাণীরা—যে কথা বলতে পারে না, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হল মুখের গঠন। মানুষের মুখের ভিতরের এবং বাইরের গঠন কথা বলার পক্ষে সুবিধাজনক। যেমন—

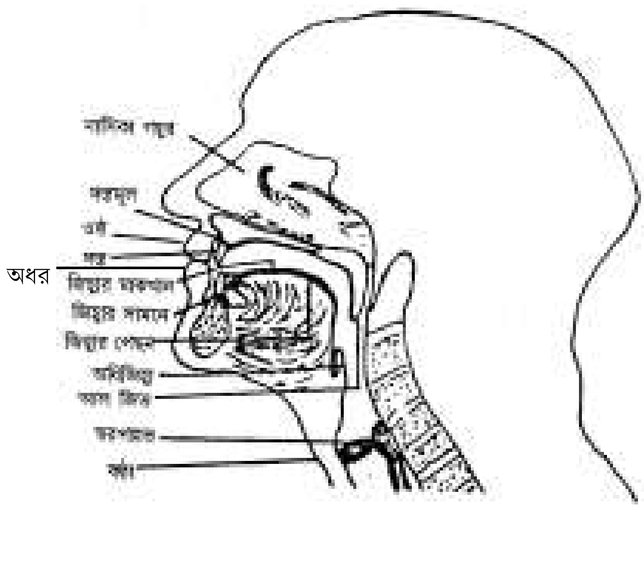

চোয়াল—হালকা এবং বারবার ওঠানামা করার উপযুক্ত।

মাংসপেশী—নমনীয় এবং নাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধাজনক। ঠোঁট, দাঁত, জিভ, আলজিভ, অধিজিহ্বা, তালু, স্বরপল্লব, ফুসফুস—এ সবই কথা বলার সময় নানাধরনের কাজ করে।

আমরা অনবরতই শ্বাস নিচ্ছি এবং ফেলছি, মুখ আর নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে সোজা শ্বাসনালি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ফুসফুসে। আবার ফুসফুস থেকে সেই বাতাস বেরিয়ে আসছে বাইরে। এই বাতাস বেরিয়ে আসার সময়েই আমরা 'কথা' বলে থাকি। বাতাস প্রথমে এসে ধাক্কা মারে **স্বরপল্লবে** (Vocal fold)।

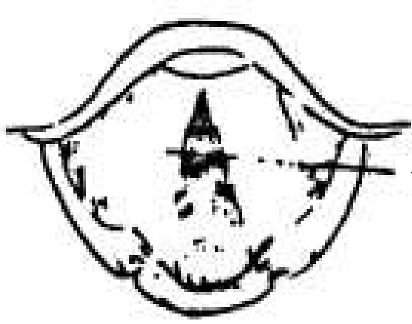

মাঝখানে চেরা পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি ও স্বরপল্লব বাতাস চেপে দিলে ফাঁক হয়ে যায় আর কাঁপতে থাকে। কথা বলার সময় এই স্বরপল্লব নানারকমভাবে কাঁপতে থাকে। কখনও বেশি কখনও-বা কম। এই স্বরপল্লবের উপরটা ঢাকা থাকে একটা শব্দ আবরণ দিয়ে। বাইরে থেকে হাত দিয়ে গলায় উঁচুমতো একটা জায়গা ঠেকে, তার মাঝখানে একটু ফাঁকা অংশ। একে বলে **অ্যাডাম্‌স অ্যাপেল**। বাতাস এরপর গিয়ে ধাক্কা মারে **অধিজিহ্বাতে** (Epiglottis)। শ্বাসনালির উপরে ঢাকনামতো একটা অংশ আছে। একে অধিজিহ্বা বলে। কথা বলার সময় বাতাসের ধাক্কায় এটি উপরে ওঠে, আবার খাওয়ার সময় এটি ঢাকনার মতো শ্বাসনালিকে চাপা দিয়ে দেয়। এইজন্য খাবার সময় কথা বলতে গেলে আমাদের বিষম লাগে। আর মনে করি কেউ বোধহয় নাম করছে বা গাল দিচ্ছে। অনেকে 'ষাট' 'ষাট' বলে মাথায় চাপড় মেরেও দেন। এরপর কথা বলার সময় বাতাস কোথাও বাধা না-পেয়ে, আংশিক বাধা পেয়ে বা পুরোপুরি বাধা পেয়ে নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে পেরোয়। এই সময় জিভ মুখের ভিতরে উপরে ওঠে, নীচে নামে, সামনে যায় এবং পিছনে আসে। তালু সংকুচিত হয়, ঠোঁট ছড়িয়ে যায়, কুঁচকে যায়, খুলে যায় ও বন্ধ হয়। চোয়াল ওঠানামা করে। মুখের মাংসপেশিই এইসব নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে।

কথা বলার সময় কোন্ কোন্ অংশ কাজ করে, বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি মিলিয়ে দেখে নিন। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পড়ার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি সামনে রেখে পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে।

৩.৩.২ বাংলা ভাষার ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এখন, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করি।

যদি কোনো বাঙালিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি যে ভাষাটা ব্যবহার করেন, তাতে ক-টা ধ্বনি আছে বলুন তো? একটু ভেবে, হয়তো কিছুটা অনিশ্চিতভাবে তিনি উত্তর দেবেন, কেন, গোটা পঞ্চাশেক? মানে, স্বরবর্ণ এই গোটা বারো, আর ব্যঞ্জন হল গিয়ে—কটা যেন?

আমরা বলব, না মশাই, আপনি ঠিক ধরতে পারেননি। আমরা বর্ণ ক-টা জানতে চাইনি। 'ধ্বনি' ক-টা জানতে চেয়েছি।

কেন? বর্ণ আর ধ্বনি কি এক নয়?

না; ধ্বনির হয় উচ্চারণ, আর বর্ণ হল লেখার চিহ্ন। একটা মুখে বলি, কানে শুনি, আর একটা কাগজের উপর লেখা বা ছাপা প্রতীক চিহ্ন, সেটা চোখে দেখি। অনেক পাঠক শুনলে অবাক হবেন, মান্য বাংলায় আমরা মুখে বলি সাতটা স্বরধ্বনি, কিন্তু লেখায় লিখি এগারোটা স্বরবর্ণ। বর্ণকে আমরা অনেক সময় 'অক্ষর'-ও বলি, কিন্তু অক্ষর বলতে আমরা আর একটা জিনিস বোঝাব। একবারের চেষ্টায় একটি শব্দের যতটা অংশ উচ্চারণ করা যায় তাকে আমরা **অক্ষর** (Syllable) বলব। তাই 'ক-অক্ষর' 'যুক্তাক্ষর' না-বলে লেখার বেলায় 'ক-বর্ণ' 'যুক্তবর্ণ' বলব, উচ্চারণের বেলায় 'ক-ধ্বনি' 'যুক্তধ্বনি' বলব।

৩.৪ সারাংশ-১

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র কথা বলার উপযুক্ত। জিভ, চোয়াল, মুখের মাংসপেশি, আলজিভ, অধিজিহ্বা, স্বরপল্লব-কথা বলার সময় নানা ভূমিকা পালন করে।

আমরা উচ্চারণ করি ধ্বনি আর লিখি বর্ণ। আর এক ঝোঁকে যতগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলি, তার নাম অক্ষর।

৩.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১। (ক) আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে যেসব অংশ রয়েছে, পরপর সাজিয়ে তাদের নাম লিখুন। ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব অংশ কাজে লাগে, কেবলমাত্র তাদের নাম লিখবেন।

(খ) ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ কী কী কাজ করতে পারে?

(গ) মুখের মাংসপেশি কীভাবে ধ্বনির উচ্চারণে সাহায্য করে?

২। (ক) ধ্বনি আর বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কী?

(খ) বর্ণ আর অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) অ ক ং ঁ —এগুলি ধ্বনি না বর্ণ না অক্ষর?

৩। নীচের কথাগুলি পুরো করার জন্য ডানদিকে দেওয়া শব্দগুলি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) আমরা যা উচ্চারণ করি, তার নাম—(১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) লিপি।

(খ) আমরা যা লিখি, তার নাম—(১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) অক্ষর।

(গ) আমরা একেবারে যতটুকু উচ্চারণ করি, তার নাম—(১) বর্ণ (২) ধ্বনি (৩) অক্ষর।

৩.৬ মূলপাঠ-২

এককের ২য় অংশে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাভাষার দু-রকমের ধ্বনি—স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জনধ্বনি। পাশাপাশি স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারটাও জেনে নেওয়া যাবে। এই অংশেই আমরা দেখতে পাব কোন্ ধ্বনির উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে।

৩.৬.১ স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ

বাংলা স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ পাশাপাশি দেখি আমরা :

উচ্চারিত স্বরধ্বনি	লেখার স্বরবর্ণ
অ, আ, ই	অ আ ই ঈ
উ, এ ও,	উ ঊ ঋ
অ্যা	এ ঐ ও ঐ

বাকিগুলির কী হল তাহলে? বাকিগুলি লেখার সময় লিখি, কিন্তু উচ্চারণ করি না। বাংলায় ই-ঈ বা উ- ঊ যেভাবে লেখা হয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ সেভাবে হয় না। ঋ আসলে রি উচ্চারণই করি আমরা। ওই বাংলায় ও + ই আর, ঔ বাংলায় ও + উ। একটা স্বর নয়, উচ্চারণ দুখানা, আসলে বলতে পারি দেড়খানা স্বর। এদের বলে দ্বিস্বর। ফলে এক স্বরধ্বনির তালিকায় তারা থাকবে কেন?

৩.৬.২ দ্বিস্বরধ্বনি আর অর্ধস্বরধ্বনি

বর্ণমালার বর্ণে দ্বিস্বর এই দুটোমাত্র, কিন্তু বাংলা শব্দের মধ্যে উচ্চারণে দ্বিস্বর আছে আরো অনেকগুলো— পাশে (ব্র্যাকেটে) উদাহরণসুদ্ধ তার তালিকা দিচ্ছে—অএ্ = অয় (হয়), অও্ (হও), আই্ (ভাই), আউ্ (ঝাউ), আএ্ = আয় (আয়, হায়), আও্ (যাও), ইই্ (দিই), ইউ্ (শিউ-লি), এই্ (নেই) , এউ্ (ঢেউ), এও্ (দেও-য়া), অ্যাএ্ = অ্যায় (দেয়, নেয়), অ্যাও্ (ন্যাও-টা), এই্ (বই), ওউ্ (মউ), ওএ্ = ওয় (ধোয়), ওও্ (ছোঁও)—অর্থাৎ প্রায় সতেরোটার মতো। কিন্তু এদের মাত্র দুটিকে এক বর্ণে লেখা হয়—ঐ, ঔ। বাকিগুলিকে ভেঙে দটি স্বরবর্ণে লিখতে হয়।

দ্বিস্বর আসলে একটি পূর্ণস্বর ও একটি অর্ধস্বর। অর্ধস্বর কী? না, আধখানা উচ্চারিত হওয়া স্বর। 'মই' কথাটার ই উচ্চারিত হচ্ছে আধখানা, কিন্তু 'ময়ী' কথাটার ই উচ্চারিত হচ্ছে পুরো। আধখানা উচ্চারিত স্বরের তলায় হসন্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা। বাংলায় আছে মোট এরকম চারটি অর্ধস্বর—ই্, উ্, এ্, ও্। এ্-কে লেখার সময় আমরা লিখি 'য়' হিসেবে, যার উচ্চারণ হসন্ত। অর্থাৎ তার পরে কোনো স্বর উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'হয়'।

৩.৬.৩ স্বরধ্বনির উচ্চারণ

স্বরধ্বনির উচ্চারণের উৎপত্তি হচ্ছে শ্বাসনালির স্বরপল্লবে, কিন্তু স্বরধ্বনির পার্থক্য তৈরি হচ্ছে মুখগহ্বরের মধ্যে। তা কী করে হয়? তা হল জিভের ওঠা-নামা ও এগোনো-পিছোনো এবং ঠোঁট দুটির সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা। মুখের পথ বন্ধ না-করেও স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ দু-রকমভাবে চলাফেরা করে—১. উপরে-নীচে, ২. সামনে-পিছনে; আর ঠোঁট দুটিও খোলা অবস্থাতেই গোল, ছড়ানো, কম খোলা, বেশি খোলা ইত্যাদি আকৃতি নেয়। জিহ্বা ও ঠোঁটের এই গতি ও আকৃতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেই স্বরধ্বনিগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, চলিত ভাষায় সাতটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে এই ব্যাপারগুলি ঘটে—

আ : জিভ নীচে পড়ে থাকে, এগোয় না, পিছোয়-ও না, ঠোঁট দুটি বেশ খুলে থাকে।

অ : জিভ সামান্য একটু উঠে পিছিয়ে যায়, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর মতো অতটা নয়) অবস্থাতেই 'গোল' হয়;

অ্যা : জিভ সামান্য একটু উঠে একটু এগিয়ে আসে, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর চেয়ে কম) অবস্থাতেই 'ছড়িয়ে' থাকে।

ও : জিভ আর-একটু উঠে পিছিয়ে আসে; ঠোঁট দুটি গোল থাকে, তবে অ্যা-র বেলায় যতটা খোলা ছিল ততটা থাকে না।

এ : জিভ ও-র ধরনের উঠে আসে। কিন্তু এগিয়ে যায়; ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে থাকে, তবে অ্যা-র বেলায় যতটা খোলা ছিল ততটা থাকে না।

উ : জিভের পিছনটা বেশ উপরে উঠে আসে এবং জিভটাও পিছিয়ে যায়। মুখ গোল থাকে, কিন্তু তার পথটা বেশ সরু দেখায়।

ই : জিভের সামনেটা বেশ উপরে উঠে আসে। ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু খুব খুলে থাকে না। (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বরধ্বনিগুলি বলে ঠোঁটের আকৃতি লক্ষ্য করুন)।

৩.৬.৪ ব্যঞ্জনধ্বনি আর ব্যঞ্জনবর্ণ

তার তালিকা এই—	**উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি**	**লেখার ব্যঞ্জনবর্ণ**
	ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্	ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্

চ্ ছ্ জ্ ঝ্	চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্	ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্	ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্
র্ ল্ শ্ (স্)	য্ র্ ল্ ব্ শ্
হ্ ড়্ ঢ়্	ষ্ স্ হ্ ড়্ ঢ়্
	য্ ৎ ং ঃ ঁ

বর্ণমালার বাকি ব্যঞ্জনগুলির কপাল এইরকম—ঞ্ আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। ঞ্ (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) আর ণ্ (প্রায় সবসময়) দুই-ই আমরা ন্-এর মতো উচ্চারণ করি। য্-এর উচ্চারণ হয়ে গেছে জ্-এর মতো। য্-এর উচ্চারণ ভুলে গেছি। ং-এর উচ্চারণ করি ঙ্-এর মতো। চন্দ্রবিন্দু আসলে অনুনাসিক 'নাকা' হয়ে যায়। তা স্বরধ্বনির সঙ্গে করি অর্থাৎ স্বরধ্বনিটাই 'নাকা' হয়ে যায়। যখন বলি 'চাঁদ' তখন আসলে আ-তে নাকা আওয়াজ হচ্ছে। বলি বটে 'চ' এ চন্দ্রবিন্দু, কিন্তু সেটা লেখার বর্ণনা, উচ্চারণের ঠিক রিপোর্ট নয়।

তাহলে যদি আবার প্রশ্ন করি, ধ্বনি ক-টা আর কী কী, তার উত্তর হল—

স্বর : সাতটা; এ সাতটাই 'নাকা' (= অনুনাসিক) হতে পারে।

অর্ধস্বর : চারটে।

ব্যঞ্জন : তিরিশটার মতো।

তিরিশটার মতো কেন? নাস্ (ইংরেজি S-এর মতো) আসলে শ্-এরই আরেকটা রূপ, না আলাদা ধ্বনি তা নিয়ে একটু তর্ক আছে। আমাদের মতে শ্-এরই অন্যরকম উচ্চারণে তৈরি হয় 'সামবাজারের সসিবাবুর' স। তবে, 'মস্ত', 'বস্তি', 'সস্তা' শব্দে যে যুক্তধ্বনি রয়েছে (স্ত), তার স্-এর উচ্চারণ শ্ থেকে একটু আলাদা।

৩.৬.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে প্রধান ভূমিকা জিভ আর ঠোঁটের। কণ্ঠনালির স্বরপল্লবের কম্পনে যে ধ্বনির সৃষ্টি হল, তা স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে বিনাবাধায় প্রকাশিত হয় এবং স্বরধ্বনিই আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাই। কিন্তু ব্যঞ্জনের উচ্চারণ এই ধ্বনির নির্গমে বাধা ঘটিয়ে করতে হয়। জিভের দ্বারা মুখের ছাদে অর্থাৎ তালুতে নানা জায়গা ছুঁয়ে কিংবা ঠোঁটদুটি বন্ধ করে ধ্বনিবাহী বহির্গামী বাতাসের পথ রুদ্ধ বা সংকীর্ণ

করে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ঘটাতে হয়। মনে রাখবেন, ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আসলে স্বরের উচ্চারণে বাধা ঘটিয়ে হয়। বেশিরভাগ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নিঃশব্দ। তা আমরা শুনতে পাই না, তার ব্যঞ্জন বা আভাস পাই মাত্র। সেইজন্যই হয়তো এর নাম ব্যঞ্জন।

চলিত বাংলা ভাষার তিরিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে বাগ্‌যন্ত্রের কোন্ অংশ কী কাজ করে তা লক্ষ করুন—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ	: জিভের পিছনটা একটু উঁচু হয়ে আলজিভের গোড়ার কাছাকাছি নরম তালু ছুঁয়ে ফেলে।
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্	: জিভের সামনের অংশটা তালুর সামনের শক্ত অংশ ছুঁয়ে থাকে।
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ র্ ড় ঢ়	: জিভের ডগা উল্‌টে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয়।
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ স্	: জিভের ডগা উপরের পাটির মাঝামাঝি দাঁতের ঠিক উপরের মাড়িতে সংলগ্ন হয়ে থাকে।
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	: ঠোঁটদুটি পুরোপুরি অথবা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
ল্	: জিভের ডগা কখনো উপরের পাটির মাঝামাঝি দাঁতের ঠিক ওপরের মাড়িতে আটকে থাকে ('আলতা'-র ল্), আবার কখনো জিভের ডগা উল্‌টে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয় ('উল্‌টা'-র ল্)।
হ্	: ফুসফুস থেকে শ্বাসনালির পথে বাতাস যখন ধ্বনি বয়ে নিয়ে মুখের ভিতরের দিকে আসতে থাকে, তখন শ্বাসনালিতে একটু চাপ পড়ে।

৩.৬ সারাংশ-২

বাংলায় স্বরবর্ণ এগারোটি, কিন্তু স্বরধ্বনি মাত্র সাতটি। জিভের ওঠা-নামা, এগোনো-পিছোনো এবং ঠোঁটের সংকোচন-প্রসারণের সাহায্যে। এইসব স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয়। অন্যদিকে, ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলায় চল্লিশটি লেখা হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি মাত্র তিরিশটি। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণেও আসল কাজটা করে জিভ আর ঠোঁট। জিভের কোনো অংশ কখনো কখনো তালুর কোনো অংশ ছুঁয়ে, কখনো দাঁতের উপরের মাড়িতে সংলগ্ন থেকে অথবা ঠোঁটদুটি কখনো পুরোপুরি বন্ধ থেকে এইসব ধ্বনির উচ্চারণ ঘটায়।

৩.৭ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১। (ক) বাংলা ভাষার স্বরধ্বনি রয়েছে (১) ১৩টি

(২) ১০টি

(৩) ৭টি

(৪) ৫টি।

(খ) বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে (১) ৪০টি

(২) ৩০টি

(৩) ৩৬টি

(৪) ১২টি।

২। নীচে অর্ধস্বরধ্বনি ও দ্বিস্বরধ্বনি মেশানো আছে। কোন্‌টি অর্ধস্বরধ্বনি আর কোন্‌টি দ্বিস্বরধ্বনি লিখুন।

এও্‌ ই্‌ এই্‌ ও্‌ আউ্‌ উ্‌ অও্‌ এ্‌।

৩। কোন্‌ ধ্বনির উচ্চারণ হয় লিখুন।

(ক) যখন, জিভের পিছনটা বেশ উপরে উঠে আসে এবং জিভটাও পিছিয়ে যায়। মুখ গোল থাকে, কিন্তু তার পথটা বেশ সরু দেখায়।

(খ) যখন, জিভের ডগা উল্‌টে গিয়ে তালুর উপরের অংশে ঘা দেয়।

(গ) যখন, ঠোঁটদুটি হয় পুরোপুরি, না-হয় প্রায়-পুরোটাই বন্ধ করতে হয়।

৩.৮ বাংলা লিপি

বাংলা লিপির উদ্ভব

উচ্চারিত ধ্বনিকে লিখিত রূপ দেওয়ার এবং পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনে লিপির উদ্ভব। অন্তরের আবেগকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকেও লিপির উদ্ভব।

লিপির উদ্ভব ও বিকাশে কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যায়। দশ বারো হাজার বছর আগে মানুষ ছবির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। ইউরোপের বিভিন্ন পর্বতগুহায় এই ধরনের ছবি পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা নানা রঙের দড়িতে গিঁট দিয়ে বিশেষ ঘটনা নথিভুক্ত করত। এই পদ্ধতির নাম কুইপু (Quipu)।

লিপির উদ্ভবের দ্বিতীয় পর্যায়ের লিপিকে চিত্রলিপি (Pictogram) এবং ভাবলিপি (Ideogram) বলে। এখানে কোনো বস্তু বোঝাতে তার রেখাচিত্র ব্যবহার করা হত। তৃতীয় পর্যায়ে এইসব বিষয় ও বস্তুজ্ঞাপক (ধ্বনিগুচ্ছ) নির্দেশ করতে লাগল। একে বলে শব্দলিপি (Phonogram)। প্রাচীন মিশরের চিত্রপ্রতীক লিপি (Hieroglyphic) ও প্রাচীন চীনের লিপি এই পর্যায়ের।

পরবর্তী পর্যায়ে রেখা সংক্ষিপ্ত বা সাংকেতিক হয়ে গেল। এবং শব্দলিপি সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে শুধু আদ্য অক্ষরটিকে নির্দেশ করল। অর্থাৎ শব্দলিপি অক্ষরলিপিতে (Syllabic Script) পরিণত হল। পঞ্চম পর্যায়ে অক্ষরলিপি ধ্বনিলিপি (Alphabetic Script) হয়ে উঠল।

আধুনিক সভ্যজগতের লিপিমালা উদ্ভূত হয়েছে চারটি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি থেকে। (১) মিশরীয় চিত্রলিপি (২) ভারতীয় চিত্রলিপি (৩) চীনীয় চিত্রলিপি এবং (৪) মেসোপটেমীয় বাণমুখ (Cuniform) লিপিচিত্র।

মিশরীয় লিপিচিত্র থেকে ইউরোপীয় এবং আরামীয়-হিব্রু-আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুটি খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী, অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মী লিপি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিব্বতী-বর্মী-যবদ্বীপের লিপি-কোরীয় প্রভৃতি পূর্ব এশীয় লিপিমালায় পরিণত হয়েছে। গুপ্ত শাসনকালে ব্রাহ্মীলিপি ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে রূপ পায় তাকে 'কুটিল' লিপি বলা হয়। এই কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাংলা বর্ণমালা তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

৩.৯ অনুশীলনী-৩

ক. (১) আদিম মানুষের আঁকা প্রথম চিত্র কোথায় পাওয়া গেছে?

(২) আধুনিক লিপিমালা কোন্ কোন্ লিপিপদ্ধতি থেকে পাওয়া গেছে?

(৩) হিব্রু, আরবী প্রভৃতি বর্ণমালা কোথা থেকে এসেছে?

(৪) মেসোপটেমিয়ার লিপিচিত্রের নাম কী?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(১) দক্ষিণ আমেরিকার ________ ________ নানা রঙের দড়িতে গিঁট দিয়ে ________ ________ নথিভুক্ত করত। এই পদ্ধতির নাম ________।

(২) মিশরীয় লিপিচিত্র থেকে ইউরোপীয় এবং ________ ________ ________ প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি।

(৩) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুটি ________ এবং ________।

(৪) এই ________ লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব।

৩.১০ সহায়ক গ্রন্থ

ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন।

সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

একক -৪ ❑ বাংলা ব্যাকরণ

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ সন্ধি

 ৪.৩.১ স্বরসন্ধি

 ৪.৩.২ ব্যঞ্জনসন্ধি

 ৪.৩.৩ বিসর্গসন্ধি

৪.৪ অনুশীলনী-১

৪.৫ ণ-ত্ব বিধান, ষত্ব বিধান

৪.৬ অনুশীলনী-২

৪.৭ বাক্য সংকোচন

৪.৮ অনুশীলনী-৩

৪.৯ বাক্য গঠন

৪.১০ অনুশীলনী-৪

৪.১১ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

৪.১২ অনুশীলনী-৫

৪.১৩ সহায়ক গ্রন্থ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—

- বাংলা ভাষার কতকগুলি প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- বাংলা ভাষা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মগুলি এই অংশে খুব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর সবগুলিই বাংলা পাঠের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়।

৪.৩ সন্ধি

'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন, মিশে এক হয়ে যাওয়া বা জোড়া লাগা। দুটি আলাদা শব্দ সন্ধি হয়ে হয়

সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এই সন্ধিবদ্ধ শব্দকে ভাঙলে তাকে বলে সন্ধিবিচ্ছেদ। সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার—(১) স্বরসন্ধি ও (২) ব্যঞ্জনসন্ধি। এছাড়া আছে বিসর্গ সন্ধি—এটি মূলত ব্যঞ্জনসন্ধিই।

৪.৩.১ স্বরসন্ধি

পাশাপাশি বা খুব কাছাকাছি থাকা দুটি স্বরধ্বনির অর্থযুক্ত মিলনকে বলে স্বরসন্ধি। এই সন্ধি কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়। এগুলিকে বলে সূত্র।

প্রথম সূত্র : পদের প্রথম ধ্বনিতে এবং শেষ ধ্বনিতে 'অ' এবং পরের পদের শুরুর ধ্বনিতে 'অ' থাকলে দুই-এ মিলে 'আ' হয়। ওই 'আ' আ-কার হয়ে পূর্বপদের শেষ বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

বাক্য + অংশ = বাক্যাংশ, মিষ্ট + অন্ন = মিষ্টান্ন।

দ্বিতীয় সূত্র : প্রথম পদের শেষ ধ্বনি 'আ' এবং দ্বিতীয় পদের শেষ ধ্বনি 'অ' হলে উভয়ে মিলে 'আ' হয় এবং ঐ আ-কার পূর্বপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, কারা + আগার = কারাগার।

তৃতীয় সূত্র : পদের শেষে 'ই' কিম্বা 'ঈ' থাকলে এবং পরের পদের শেষে 'ই' কিম্বা 'ঈ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ঈ'-কার হয়। ওই 'ঈ'-কার পূর্বপদের শেষে যুক্ত হয়। যেমন—

ই + ই = ঈ

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র, অতি + ইত = অতীত, মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র।

ই + ঈ = ঈ

ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ, প্রতি + ইক্ষা = প্রতীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ

রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র, যোগী + ইন্দ্র = যোগীন্দ্র।

ঈ + ঈ = ঈ

সতী + ঈশ = সতীশ, মহী + ঈশ্বর = মহীশ্বর।

চতুর্থ সূত্র : প্রথম পদের 'উ' কিম্বা 'ঊ' এবং পরের পদের প্রথমে 'ঊ' কিম্বা 'উ' থাকলে এদের মিলনে হয় 'ঊ'। এই 'ঊ' পূর্বপদের শেষ বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

উ + উ = ঊ

অনু + উদিত = অনূদিত, মরু + উদ্যান = মরূদ্যান।

উ + ঊ = ঊ

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি।

উ + উ = ঊ

বধূ + উৎসব = বধূৎসব।

ঊ + ঊ = ঊ

সরযূ + ঊর্মি = সরোযূর্মি।

৪.৩.২ ব্যঞ্জনসন্ধি

সংজ্ঞা : যে-সন্ধিতে স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন হয় অথবা ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন—

পরি + ছন্ন (ই + ছ) = পরিচ্ছন্ন

সৎ + ভাব (ৎ + ভ) = সদ্ভাব।

ব্যঞ্জনসন্ধির কতকগুলি নিয়ম বা সূত্র আছে।

(১) স্বরবর্ণ পরে থাকলে তার পূর্বেকার ক্ চ্ ট্ ত্ প্ যথাক্রমে গ্ জ্ ড্ দ্ ব্ হয়ে যায় অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়।

যেমন, দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

ষট্ + আনন = ষড়ানন

সৎ + আচার = সদাচার।

(২) প্রথম শব্দের শেষে যদি স্বরবর্ণ থাকে এবং পরের শব্দের প্রথমে যদি 'ছ' থাকে, তাহলে ঐ 'ছ' স্থানে 'চ্ছ' হয়।

যেমন,—	অ + ছ,	এক + ছত্র = একচ্ছত্র,	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ।
	আ + ছ,	আ + ছাদন = আচ্ছাদন,	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন।
	ই + ছ,	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ,	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ।
	উ + ছ,	অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ,	তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া।

(৩) প্রথম শব্দের শেষের ব্যঞ্জন যদি বর্গের প্রথম বর্ণ হয় এবং পরের শব্দের প্রথম বর্ণটি যদি বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ হয় বা য্ র্ ল্ ব্ হ্ এর একটি হয়, তাহলে প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে বদলে যাবে।

যেমন,—	দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ	ষট্ + ভুজ = ষড়্‌ভুজ
	উৎ + বোধন = উদ্বোধন	অপ্ + দ = অব্দ।

(৪) বর্গের পঞ্চম বর্ণ (নাসিক্য বর্ণ) পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণ পঞ্চম বর্ণে রূপান্তরিত হবে।

যেমন,—	দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্‌মণ্ডল	চিৎ + ময় = চিন্ময়

জগৎ + মাতা = জগন্মাতা।

(৫) আগে 'ম' পরে 'ন' থাকলে দুইয়ে মিলে 'ন্ন' হবে।

যেমন,— সম্ + নিবেশ = সন্নিবেশসম্ + নিহিত = সন্নিহিত।

(৬) প্রথম অংশের 'ত্' এর ঠিক পরে হ্ থাকলে দুটি বর্ণই বদলাবে।

যেমন,— উৎ + হত = উদ্ধত উৎ + হার = উদ্ধার।

এছাড়াও আরও অনেকগুলি নিয়ম ব্যঞ্জনসন্ধিতে আছে।

(ক) যেমন, 'দ্' ও 'ধ' এর পর কোনো বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অথবা স পরে থাকলে ও দ্, ধ্ স্থানে ত্ হয়। যেমন,—

বিপদ + কাল = বিপৎকাল তদ্ + সম = তৎসম।

চ্ বা ছ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'চ' হয়। যেমন,—

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র উৎ + চকিত = উচ্চকিত।

(খ) 'জ্' বা 'ঝ্' পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'জ' হয়। যেমন,—

উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত।

(গ) 'শ' পরে থাকলে 'ত' ও 'দ', 'চ' এ পরিণত হয় 'শ' হয় 'ছ'। যেমন,—

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

(ঘ) 'ল' বর্ণ পরে থাকলে ত্ ও দ্ তার প্রভাবে 'ল্' হয়ে যায়। যেমন,—

উৎ + লাস = উল্লাস উৎ + লিখিত = উল্লিখিত।

(ঙ) 'চ' বর্গের কোনো বর্ণের পর ন্ থাকলে তা ঞ হয়ে যায়। যেমন,—

রাজ্ + নী = রাজ্ঞী যজ + ন = যজ্ঞ।

(চ) 'উৎ' উপসর্গের পর স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর 'স' লোপ পায়। যেমন,—

উৎ + স্থান = উত্থান উৎ + স্তম্ভ = উত্তম্ভ।

(ছ) ট্, ঠ্, ষ, হল মূর্ধন্য ধ্বনি এর সঙ্গে ত্, থ্, দ্ যুক্ত হলে ওই ত্, থ্, দ্,—ট্, ঠ্, ড্-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন,—

উৎ + ডীন = উড্ডীন সৃষ্ + তি = সৃষ্টি

রুষ + ত = রুষ্ট ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

(জ) প্রথম শব্দের শেষে যদি ম্ থাকে তার পরে কোনো স্পর্শবর্ণ থাকে, তাহলে 'ম্' স্থানে ং (অনুস্বার) বা বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন,—

অহম্ + কার = অহংকার   সম্ + কট = সংকট

শুভম্ + কর = শুভংকর   সম্ + চয় = সঞ্চয়

পরম্ + তপ = পরন্তপ।

(ঝ) য্, র্, ল্, ব্ থাকলে প্রথম শব্দের শেষের 'ম্' স্থানে ং (অনুস্বার) হবে। যেমন,—

সম্ + যোগ = সংযোগ   সম্ + হার = সংহার।

(ঞ) দন্ত্য ন্ এর পর শ, ষ, স, হ থাকলে ন্ স্থানে ং (অনুস্বার) হবে। যেমন,—

দন্ + শন = দংশন   হিং + সা = হিংসা।

(ট) সম্ উপসর্গের পর 'কৃত', 'কার' শব্দ থাকলে 'ম্' স্থানে ং (অনুস্বার) হয়। এবং সেই সঙ্গে 'স্' এর আগম হয়। যেমন,—

সং + কৃত = সংস্কৃত   সম্ + কার = সংস্কার।

(ঠ) পরি উপসর্গের পর 'কৃত' 'কার' শব্দ থাকলেও স্ আসবে, কিন্তু ওই স ষত্ব বিধির নিয়মে 'ষ' হবে। যেমন,— পরি + কৃত = পরিষ্কৃত   পরি + কার = পরিষ্কার।

যে ব্যঞ্জনসন্ধি কোনো সূত্র বা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, অথচ বহু প্রচলিত এদের বলে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি। যেমন,—

বন + পতি = বনস্পতি   তদ্ + কর = তস্কর

দিক্ + লোক = দ্যুলোক   হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র।

৪.৩.৩ বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি তারই নাম বিসর্গ সন্ধি।

(ক) অ-কারের বিসর্গ থাকলে 'ও' হয়। যেমন,—

ততঃ + অধিক = ততোধিক   যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ।

(খ) বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র্, ল্, ব্, হ থাকলে 'ও'-কার হয়। যেমন,—

মনঃ + বীণা = মনোবীণা   যশঃ + লাভ = যশোলাভ

বয়ঃ + বৃদ্ধি = বয়োবৃদ্ধি।

উপরের ব্যঞ্জনগুলি ছাড়া অন্য ব্যঞ্জন পরে থাকলে বিসর্গ বিসর্গই থাকে, সন্ধি হয় না। যেমন,—

অতঃ + পর = অতঃপর　　　　মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর।

(গ) বিসর্গ যদি 'রঃ' জাত হয়, তাহলে সন্ধির পর 'র্' হয়। প্রায়ই তা পরবর্তী স্বরসন্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে রেফ্ হয়ে যায়। যেমন,—

পুনর্ + আগত = পুনরাগত　　　　অন্তর্ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ

অহর্ + অহ = অহরহ।

বিসর্গের পর র্ থাকলে 'ই' ও 'উ' কেবল 'ঈ' বা 'ঊ' হয়। যেমন,—

নিঃ (নির্) + রোগ = নীরোগ　　　　নিঃ (নির্) + রব = নীরব।

(ঘ) ই বা উ স্বরের পর বিসর্গ থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দ বা প্রত্যয়ের প্রথমে—স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, ল, ব, হ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন,—

নিঃ + অবধি = নিরবধি　　　　নিঃ + আশ্রয় = নিরাশ্রয়

বহিঃ + গত = বহির্গত　　　　অন্তঃ + গত = অন্তর্গত।

৪.৪ অনুশীলনী-১

(ক) ১। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী?

২। নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কী?

৩। পারস্পরিক রূপান্তর কীভাবে হয়?

(খ) বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মিলিয়ে দিন :

বামদিক	ডানদিক
১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে তার আগের ক্, চ্, ট্, ত্, প্ যথাক্রমে	ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।
২। প্রথম অংশের ত্ এর পর দ্বিতীয় শব্দের হ্ থাকলে	দুই-এ মিলে ন্ন হয়।
৩। আগে ম্ পরে ন্ থাকলে	গ্, জ্, ড্, দ্, ব্, হয়ে থাকে।

(গ) সন্ধিবদ্ধ করুন :

হিন্ + সা, বাক্ + দেবী, উৎ + জ্বল, সৎ + ইচ্ছা, হরি + চন্দ্র।

(ঘ) সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

সরোবর, পুরোহিত, তিরস্কার, অন্তরাত্মা, পুনর্জন্ম।

(ঙ) ১। বিসর্গ সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণসহ বলুন।

২। বিসর্গ সন্ধি কোন্ জাতীয় শব্দে প্রযুক্ত হয়? তৎসম, দেশী বা বিদেশী?

(চ) ভুল সংশোধন করুন :

জ্যোতির্ + ইন্দ্র = জ্যোতীন্দ্র, মনঃ + মন্দির = মনমন্দির,

অন্তর + পুর = অন্তরপুর, নিঃ + সন্দেহ = নিস্বন্দেহ।

(ছ) ঠিক বিবৃতির পাশে (✓) চিহ্ন দিন :

১। সন্ধি হয় ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির

২। সন্ধি হলে শব্দের অর্থের বদল হয়।

৩। স্বরের সঙ্গে স্বরের বর্ণগত মিলন হল স্বরসন্ধি।

৪। সন্ধি হয় প্রথম পদের শেষ ধ্বনি এবং পরের পদের প্রথম ধ্বনির সঙ্গে।

(জ) সূত্র উল্লেখ করে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

সদানন্দ বিদ্যালয়

পৃথ্বীশ অতীত

মিষ্টান্ন মণীশ

৪.৫ ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান

ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ মূর্ধন্য (ণ) বাংলা ভাষায় এসে নিজস্ব উচ্চারণটি হারিয়ে ফেলেছে। ন এবং ণ দুটির উচ্চারণ এক হয়ে যাওয়ায় কোথায় 'ন' এবং কোথায় 'ণ' হবে তা স্থির করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঠিক এমনই 'শ', 'ষ', 'স'—উষ্ণবর্ণের এই তিনটি বর্ণ প্রায় একইভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

বাংলা বানানে কোথায় 'ন' কোথায় 'ণ' হবে, তা যে নিয়মে জানা যায় তার নাম ণত্ব বিধান। অবশ্য এই নিয়ম তৎসম শব্দেই খাটে। তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করা উচিত নয়।

(ক) ঋ, র, ষ্—এর যে কোনো একটি বর্ণের পরে 'ন' থাকলে 'ণ' হয়। যেমন, কর্ণ, ঋণ, তৃণ, বর্ণনা ইত্যাদি।

(খ) ঋ র্ ষ্ এর ঠিক পরেই যদি 'ন' এর আগে কোনো স্বরবর্ণ, 'ক' বর্গ, বা 'প' বর্গের কোনো বর্ণ

বা য, ব, হ, ং থাকে, তাহলেও ন স্থানে ণ হয়। যেমন—রণ (র + অ + ণ), মগ্ন, রামায়ণ, আঘ্রাণ— ইত্যাদি।

(গ) একপদে ঋ, র্, ষ্ অন্য পদে ন থাকলে যদি সমাসবদ্ধ হয়, তবে সেখানে ণ হয় না। তবে, সমাসবদ্ধ পদে যদি ব্যক্তি নাম বা বস্তু নাম বোঝানো হয় তবে ন স্থানে ণ হয়। যেমন, শূর্পণখা, অগ্রহায়ণ ইত্যাদি।

(ঘ) প্র, পরা, পরি, নির উপসর্গের পর ণ হয়। যেমন—প্রণব, পরায়ণ, পরিণীতা, নির্ণয় ইত্যাদি।

(ঙ) ট—বর্গের কোনো বর্ণের ঠিক পূর্বে নাসিক্যবর্ণের প্রয়োজন হলে সবসময় ণ হয়।

পদের শেষস্থ ন কখনো মূর্ধন্য (ণ) হয় না। যেমন, শ্রীমান, আয়ুষ্মান ইত্যাদি। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে নই হয়।

কিছু নিত্য ণ হয় এমন শব্দ আছে। যেমন—অণু, বীণা, গণনা, মণি, অণিমা ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান : স কোন স্থানে মূর্ধন্য ষ হয়, যে-নিয়মের দ্বারা তা জানা যায়, তাকে 'ষত্ব বিধান' বলে। এই নিয়ম তৎসম শব্দেই প্রযোজ্য।

(ক) অ-কার ও আ-কার ব্যতীত ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে এবং ক্ ও র্ এর পরে প্রত্যয় ও বিভক্তির দন্ত্য স মর্ধন্য ষ হয়। যেমন, ভবিষ্যৎ, বিষম, সুষমা ইত্যাদি। কল্যাণীয়েষু ষ, কিন্তু কল্যাণীয়াসু মধ্যে আ-কার থাকায় স হচ্ছে।

(খ) ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গে পরে অবস্থিত কয়েকটি স্থানে দন্ত্যস (স) মূর্ধন্যষ (ষ) হয়। যেমন—বিষণ্ণ, উপনিষৎ, প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি।

(গ) সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য স কখনো মূর্ধন্য ষ হয় না। যেমন—ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

(ঘ) শিষধ্বনিযুক্ত ট ও ঠ-এর পূষ ষ হয়। যেমন—অষ্ট কষ্টি। কিন্তু ত ও থ আগের স দন্ত্য স-ই থাকে— নিস্তেজ, সুস্থ।

(ঙ) স্ফুট্ ও স্ফুর্ ধাতুর স, ষ হয় না।

(চ) কিছু শব্দ নিত্য মূর্ধন্য ষ। যেমন—মাষা, ষট্, বাষ্প ইত্যাদি।

৪.৬ অনুশীলনী-২

(ক) ১। ণত্ব-বিধান কাকে বলে? কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করে, উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২। কোথায় এই বিধান প্রযুক্ত হয় না? তার কয়েকটি উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।

(খ) ১। যত্ব-বিধান কাকে বলে? কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ করে উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২। স্বাভাবিক ষত্বের পরিচিত কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখান যে, সেগুলি কোনো নিয়মেই পড়ে না।

(গ) **শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :**

সায়া ________, অপরা ________, মধ্যা ________ পূর্বা ________ (হ্ন হ্ণ)

অম্বে ________ ________ ব ________ না,

কলিদা ________ মনী ________ (ন/ণ, স/ষ)

(ঘ) **ভ্রম সংশোধন করুন :**

সুসুপ্তি, পরিস্কার, দুর্বিসহ, শূন্য, আস্পদ, নারাণ, জিনিষ, বাস্প।

৪.৭ বাক্য সংকোচন

মনের কোনো ভাবকে একাধিক পদে প্রকাশ না করে প্রয়োজন মতো একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। একাধিক পদকে একটি শব্দে প্রকাশ করার নাম বাক্যাংশ সংকোচন। কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যে বাক্যাংশ সংকোচন করা হয়। নীচে এই ধরনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

যা দেখা যায় না	—	অদৃশ্য।
যা বলা হয়েছে	—	উক্ত।
যেখানে যাওয়া যায় না	—	অগম্য।
যা পোড়ে না	—	অদাহ্য।
যা সাধন করা যায় না	—	অসাধ্য।
যা অতিক্রম করা যায় না	—	অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য।
যিনি আগে জন্মগ্রহণ করেছেন	—	অগ্রজ।
যার অন্তিমকাল উপস্থিত	—	মুমূর্ষু।
যা আগে কোনো দিন শোনা যায়নি	—	অশ্রুতপূর্ব।
যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না	—	অনির্বচনীয়।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না	—	কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ।
অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা	—	অনুসন্ধিৎসা
হত্যা করার ইচ্ছা	—	জিঘাংসা।

যার ভিতর সার বস্তু কিছুই নেই	—	অন্তঃসারশূন্য।
যে পুরুষ বিয়ে করেনি	—	অকৃতদার।
যা অবশ্যই হবে	—	অবশ্যম্ভাবী।
যা বলা যায় না	—	অকথ্য
যা চিবিয়ে খেতে হয়	—	চর্ব্য।
যা চুষে খেতে হয়	—	চোষ্য।
যা চেটে খেতে হয়	—	লেহ্য।
যা পান করা হয়	—	পেয়।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	—	আপাদমস্তক।
যা সহজেই ভেঙে যায়	—	ভঙ্গুর।
যা দিনে দিনে বাড়ে	—	বর্ধিষ্ণু।
যে নারীর পতি বা পুত্র নেই	—	অবীরা।
যিনি ব্যাকরণ জানেন	—	বৈয়াকরণ।
যিনি নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন	—	পণ্ডিতন্মন্য।
যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখেনি	—	অসূর্যম্পশ্যা।
যার মৃত্যু নেই	—	অমর।
দিনের শেষ ভাগ	—	অপরাহ্ন।
হরিণের চামড়া	—	অজিন।
যা চিন্তা করা যায় না	—	অচিন্তনীয়।
যা কল্পনা করা যায় না	—	অকল্পনীয়।
যার এখনো দাড়ি গোঁফ গজায়নি	—	অজাতশ্মশ্রু।
যে শত্রুকে দমন করেছে	—	অরিন্দম।
যিনি প্রবাসে থাকেন	—	প্রবাসী।
যা উড়ে যাচ্ছে	—	উড়ন্ত।
সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত	—	আসমুদ্রহিমাচল।
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে	—	আস্তিক।
ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন	—	ইন্দ্রজিৎ।
জল ও স্থল উভয় জায়গায় যে চলে	—	উভচর।
যা মাটি ভেদ করে ওপরে ওঠে	—	উদ্ভিদ।

এক থেকে আরম্ভ করে	—	একাদিক্রমে।
যিনি দিনে একবার আহার করেন	—	একাহারী।
যিনি ইতিহাস লেখেন	—	ঐতিহাসিক।
যে ফল পাকলেই গাছ মরে যায়	—	ওষধি।
জানবার ইচ্ছা	—	জিজ্ঞাসা।
যারা ঝগড়া করছে	—	বিবদমান।
যা সব সময় দুলছে	—	দোদুল্যমান।
যার স্ত্রী মারা গেছেন	—	বিপত্নীক।
যার কাজ করবার ক্ষমতা নেই	—	অকর্মণ্য।
ময়ূরের ডাক	—	কেকা।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে	—	কৃতজ্ঞ।
কী করবে, কী না করবে বুঝতে না পারা	—	কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
সবার চেয়ে বয়সে ছোটো	—	কনিষ্ঠ।
দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ	—	গোধূলি।
যা যুক্তিসংগত নয়	—	অযৌক্তিক।
যিনি একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছেন	—	কাকবন্ধ্যা।
যা কোনো কাজের নয়	—	অকেজো।
বনে থাকে যে	—	বন্য।
রেশম দিয়ে তৈরি	—	রেশমি।
যিনি দর্শন শাস্ত্র জানেন	—	দার্শনিক।
যা অল্প সময়েই ভেঙে যায়	—	ক্ষণভঙ্গুর।
শুভক্ষণে যাঁর জন্ম	—	ক্ষণজন্মা।
চিরকাল মনে রাখবার যোগ্য	—	চিরস্মরণীয়।
যা চিরকাল মনে রাখবার যোগ্য	—	চিরন্তন।
যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন	—	জিতেন্দ্রিয়।
যার আগের জন্মের কথা স্মরণ আছে	—	জাতিস্মর।
বীণার ধ্বনি	—	ঝংকার।
ধনুকের শব্দ	—	টংকার।
তণ্ডুমুনি প্রবর্তিত নৃত্য	—	তাণ্ডব।

যিনি তির নিক্ষেপে ওস্তাদ	—	তিরন্দাজ।
যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য	—	শ্রদ্ধেয়।
যা সহজে সাধন করা যায় না	—	দুঃসাধ্য।
দূরের ঘটনাও যিনি দেখতে পান	—	দূরদর্শী।
যাঁর দেশের প্রতি প্রীতি আছে	—	দেশপ্রেমিক।
যা ভস্ম করা হয়েছে	—	ভস্মীভূত।
যিনি দুবার জন্ম নিয়েছেন	—	দ্বিজ।
যা একটি ধারা ধরে চলে	—	ধারাবাহিক।
যার জন্য কর দিতে হয় না	—	নিষ্কর।
যে এখনো সাবালক হয়নি	—	নাবালক।
নৌ চলাচলের যোগ্য	—	নাব্য।
যিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র জানেন	—	বিজ্ঞানী।
যে নারীর উপমা নেই	—	নিরুপমা।
যা খুব দীর্ঘ নয়	—	নাতিদীর্ঘ।
যা খুব গরমও নয় ঠান্ডাও নয়	—	নাতিশীতোষ্ণ।
যিনি আমিষ খান না	—	নিরামিষাশী।
পূজা পাবার যোগ্য	—	পূজ্য।
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	—	প্রত্যুৎপন্নমতি।
যে গাছ অন্য গাছের উপর নির্ভর করে	—	পরগাছা।
যে পালিয়ে যাচ্ছে	—	পলায়মান।
যে নারী প্রিয় কথা বলে	—	প্রিয়ংবদা।
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	—	প্রোষিতভর্তৃকা।
যার স্ত্রী বিদেশে থাকেন	—	প্রোষিতভার্য।
যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে	—	প্লবগ।
পথ চলার খরচ	—	পাথেয়।
যারা বিষ্ণুর উপাসক	—	বৈষ্ণব।
ভগীরথের আনীত নদী	—	ভাগীরথী।
যে মধু পান করে	—	মধুপ।
মূর্ধা যার উচ্চারণ স্থান	—	মূর্ধন্য।

যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন	—	যুধিষ্ঠির।
যার একবার শুনলেই মনে থাকে	—	শ্রুতিধর।
যিনি শুভ কামনা করেন	—	শুভাকাঙ্ক্ষী।
একই গুরুর শিষ্য	—	সতীর্থ।
যার দুই হাত সমান ভাবে চলে	—	সব্যসাচী।
সত্ত্বগুণ আছে যার	—	সাত্ত্বিক।
একই সময়কার	—	সমসাময়িক।
যার সব কিছুই হারিয়ে গেছে	—	হৃতসর্বস্ব।
যা হৃদয়ে গমন করে	—	হৃদয়ঙ্গম।
নিজেকে হীন মনে করার ভাব	—	হীনমন্যতা।
শাস্ত্র সম্বন্ধীয়	—	শাস্ত্রীয়।
যা পরিশ্রমের দ্বারা করতে হয়	—	শ্রমসাধ্য।
জয় করার ইচ্ছা	—	জিগীষা।
যার কুল শীল জানা নেই	—	অজ্ঞাতকুলশীল।
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	—	ভাষান্তরিত।
যে দুজন একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করছে	—	যমজ।
যে পরের মুখ চেয়ে থাকে	—	পরমুখাপেক্ষী।
যারা পট আঁকেন	—	পটুয়া।
আকাশে বিহার করে যে	—	বিহঙ্গ।
যে আদব কায়দা জানে না	—	বেআদব।
যিনি আয় বুঝে ব্যয় করেন	—	মিতব্যয়ী।
যা মর্ম ভেদ করে	—	মর্মভেদী।
যতদিন জীবন থাকবে	—	যাবজ্জীবন।
যে পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত	—	স্ত্রৈণ।
যার সব কিছুই চলে গেছে	—	সর্বস্বান্ত।
যে নারীর হাসি সুন্দর	—	সুস্মিতা।
যে নারীর হাসি পবিত্র	—	সুচিস্মিতা।
যিনি সব কিছুই সহ্য করেন	—	সর্বংসহ।
একই মায়ের গর্ভজাত	—	সহোদর।
যা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে	—	হৃদয়বিদারক।

যা হৃদয়কে আকর্ষণ করে	—	হৃদয়গ্রাহী।
যার উপাস্য দেবতা বুদ্ধ	—	বৌদ্ধ।
যা অনায়াসে লাভ করা যায়	—	অনায়াসলভ্য।
যা আগে ছিল এখন নেই	—	ভূতপূর্ব।
যে পরের দোষ খুঁজে বেড়ায়	—	ছিদ্রান্বেষী।
যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে	—	বিধবা।
সারাজীবন ধরে	—	আজীবন।
যে রাত্রে চোখে দেখতে পায় না	—	রাতকানা।

৪.৮ অনুশীলনী-৩

১। নীচের বাঁদিকে দেওয়া বাক্যগুলিকে ডানদিকে দেওয়া কোন্ শব্দটিকে এক কথায় ঠিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন—

(ক) যে আগে যায়	(১) দ্রুতগামী	☐
	(২) শ্লথগামী	☐
	(৩) মন্দগামী	☐
	(৪) অগ্রগামী	☐
(খ) যিনি আগে জন্মগ্রহণ করেছেন	(১) সরোজ	☐
	(২) অনুজ	☐
	(৩) অগ্র জ	☐
	(৪) পঙ্কজ	☐
(গ) দিনের শেষ ভাগ	(১) অপরাহ্ণ	☐
	(২) মধ্যাহ্ন	☐
	(৩) সায়াহ্ন	☐
	(৪) পূর্বাহ্ণ	☐
(ঘ) যে জলে ও স্থলে বাস করে	(১) খেচর	☐
	(২) স্থলচর	☐
	(৩) নিশাচর	☐
	(৪) উভচর	☐
(ঙ) স্মরণ করবার যোগ্য	(১) বরণীয়	☐

(২) স্মরণীয় ☐
(৩) বন্দনীয় ☐
(৪) আচরণীয় ☐

(চ) যা ক্ষতি করে
(১) ঘৃণাকর ☐
(২) ক্ষতিকর ☐
(৩) পুষ্টিকর ☐
(৪) সুখকর ☐

(ছ) পরলোক সম্বন্ধীয়
(১) জাগতিক ☐
(২) ইহলৌকিক ☐
(৩) ঐহিক ☐
(৪) পারলৌকিক ☐

(জ) যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে
(১) কৃতজ্ঞ ☐
(২) কৃতঘ্ন ☐
(৩) পাদক ☐
(৪) শুভদ ☐

(ঝ) যাকে ঘোরানো হচ্ছে
(১) ঘূর্ণমান ☐
(২) ঘূর্ণায়মান ☐
(৩) ঘূর্ণ্যমান ☐
(৪) দোদুল্যমান ☐

(ঞ) জীবিত থাকার ইচ্ছা
(১) জিজীবিষা ☐
(২) জিগমিষা ☐
(৩) জিহীষা ☐
(৪) জিঘাংসা ☐

২। নীচের বাক্যগুলোকে একপদে পরিণত করুন :

(ক) যার কুলশীল জানা নেই।
(খ) হনন করবার ইচ্ছা।
(গ) যার দু'হাত সমানে চলে।
(ঘ) যে ইন্দ্রকে জয় করে।
(ঙ) পা থেকে মাথা পর্যন্ত।
(চ) যে গাছ অন্য গাছের ওপর জন্মায়।

(ছ) যে নারী প্রিয় কথা বলে। (জ) যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য।

(ঝ) যার মমতা নেই। (ঞ) যে বিদেশে থাকে।

৪.৯ বাক্যের গঠন

যে কয়টি সুসজ্জিত পদ (বিভক্তিযুক্ত শব্দ) দ্বারা কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে পদগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই—(ক) আসত্তি (নৈকট্য), (খ) যোগ্যতা (অসংগতি না থাকা), (গ) আকাঙক্ষা (ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করার ক্ষমতা)।

প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি প্রধান অংশ থাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়। উদ্দেশ্য অংশে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হয় ; আর বাক্যের যে-অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাই হল বিধেয়। একটি বাক্য—জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এখানে মূল বিষয় 'জাহাজ' এইটি উদ্দেশ্য এবং 'চলেছে' এই সমাপিকা ক্রিয়াটি বিধেয়। উদ্দেশ্যকে বাড়ানো যেত, ভারতীয় বা ইতালীয় ইত্যাদি শব্দ যোগ করে। বিধেয়কে বাড়ানো যেত 'চীন পার হয়ে উত্তরে' ইত্যাদি যোগ করে।

যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে বলে সরল বাক্য। যেমন, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এখানে সমাপিকা ক্রিয়া 'আছে' উহ্য আছে। 'ভাণ্ডারে তব' 'বিবিধ' ইত্যাদি বিধেয়ের বিশেষণ।

যে বাক্যে একটিমাত্র প্রধান বাক্য এবং সেই বাক্যের উপর নির্ভরশীল একটি বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন, তেমন, যথা, তথা, যখন, তখন ইত্যাদি শব্দ দ্বারা জটিল বাক্যকে অন্বিত করা হয়। যেমন—যেহেতু তিনি সত্যের পূজারী, তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়।

এছাড়াও আর এক শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়, যাকে বলে যৌগিক বাক্য। যখন, দুই বা ততোধিক সরল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা (এবং, ও, কিন্তু, আর, অথচ ইত্যাদি) যুক্ত হয় তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন—নিন্দুকগুলো খেতে পায় না তাই মন্দ কথা বলে। বা, সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল সেজন্য বাজারে যেতে পারিনি।

এছাড়াও বাক্যের অর্থভিত্তিক কিছু শ্রেণিবিভাগও আছে। যেমন, (১) নির্দেশক বাক্য অস্ত্যর্থক এবং নঞর্থক বাক্য, (২) প্রশ্নবাচক বাক্য, (৩) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, (৪) ইচ্ছাবাচক বাক্য, (৫) সন্দেহবাচক বাক্য, (৬) আবেগবাচক বাক্য এবং (৭) শর্তসাপেক্ষ বাক্য।

৪.১০ অনুশীলনী-৪

(ক) ১। উদাহরণসহ যৌগিকবাক্যের সংজ্ঞা বলুন।

২। জটিল বাক্য কী? উদাহরণসহ বলুন।

৩। বাক্যের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

(খ) উদ্দেশ্য এবং বিধেয় নির্দেশ করুন।

১। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

২। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

৩। তুমি এমন কাজ করবে ভাবিনি।

৪.১১ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

আমরা মুখে যে বাংলা বলি, তার নাম কথ্য ভাষা, আর লেখায় যে বাংলা লিখি, তার নাম লেখ্য ভাষা। এই লেখ্য ভাষারই একটি রূপ সাহিত্যিক ভাষা, কেননা সব সাহিত্য এখন লেখাই হয়। সাহিত্য লেখার আবার দুটি রীতি—গদ্য আর পদ্য। গদ্যরীতির আছে দু-রকমের ভাষা—সাধু ও চলিত। পদ্যরীতির ভাষা অবশ্য মিশ্রভাষা—সাধু-চরিতে মেশানো। নীচের ছকটি দেখলে এই ভাগগুলি বোঝা যাবে।

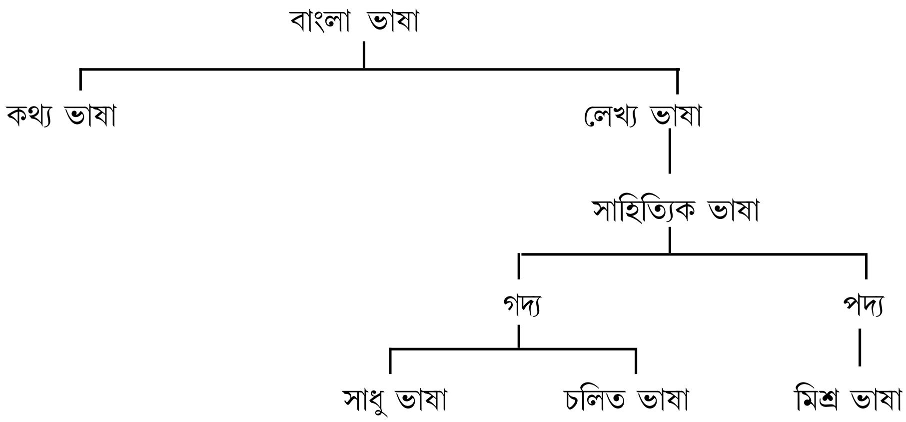

উনিশ শতকের গোড়াতেই ছাপার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি এবং আধুনিক যুগের শুরু। এর আগে প্রাচীন বাংলা ও মধ্যবাংলার সাহিত্য—পদ্য সাহিত্য। যদিও উনিশ শতকের গোড়াতেই গদ্য সাহিত্য শুরু, কিন্তু এই গদ্যের মৌখিক রূপ সম্ভবত সতেরো শতক থেকে শুরু হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার শিক্ষকরাই প্রথম গদ্য সাহিত্য শুরু করেন, যদিও এই রচনা অনেকটা কৃত্রিম ছিল। এর পরে বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা গদ্য প্রথম প্রকৃত সাহিত্যের ভাষার

মর্যাদা পেল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা সারা দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হওয়ায় কলকাতা অঞ্চলের বাংলা-ই আজকের কথ্যভাষার সর্বজনগ্রাহ্য রূপ বলে স্বীকৃত হয়। এর সাহিত্যিক নিদর্শন ১৮৬২ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষার বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল না। বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে প্রধানত সাধুভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে ওই যুগের সব প্রখ্যাত সাহিত্যিকই রচনা করেছেন সাধুভাষায়। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কিছু লেখা চলিত ভাষায় লেখেন। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী। সেই সময় থেকে কিছু কিছু চলিত ভাষায় রচনা শুরু হলেও সাধুভাষার সাহিত্যের পরিমাণের তুলনায় তা ছিল একেবারেই নগণ্য। ব্যাপকভাবে, চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয় বিশ শতকের শেষার্ধে। মোটামুটি সাহিত্যের মাধ্যম এই 'চলিত ভাষা' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' দিয়ে যার যাত্রা শুরু, তা সর্বজনীন সাহিত্যের মাধ্যম হতে লাগল প্রায় একশো বছর।

'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'র পার্থক্য দেখা যায় প্রধানত ক্রিয়াপদে, সর্বনামে ও অনুসর্গে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

		সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
(ক)	ক্রিয়াপদ	করিয়া	করে
		খাইলে	খেলে
		করিতে	করতে
		যাইতেছিল	যাচ্ছিল।
(খ)	সর্বনাম	তাহাকে	তাকে
		যাহা	যা
		ইহা	এ
		উহা	ও।
(গ)	অনুসর্গ	কর্তৃক, দিয়া	দ্বারা, দিয়ে
		মধ্য	মধ্যে
		হইতে	হতে, থেকে।

এ ছাড়া শব্দ নির্বাচনে পার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃত শব্দের বেশি প্রচলন দেখা যায় সাধু ভাষায়, তবে চলিত ভাষাতে ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লেখকের লিখন-শৈলী এবং লেখার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। কাজেই সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য মূলত ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অনুসর্গেই দেখা যায়।

এবার সাধুভাষার নমুনা দেখুন।

সাধুভাষার নমুনা :

উত্তরচরিত্রের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ (হইতে) গৃহীত। [ইহাতে] রাম **(কর্তৃক)** সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত **হইয়াছে**। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ **(হইতে)** গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমের সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত **হয় নাই**। উত্তরচরিত্রে সীতার রসাতল বাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি **বর্ণিত হইয়াছে**। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় **দিয়াছেন**। কেন না, [যাহা] একবার বাল্মীকি (কর্তৃক) বর্ণিত **হইয়াছে,** পৃথিবীর কোন কবি [তাহা] প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিত্রের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ (হইতে) গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি শেক্সপীয়র [তাঁহার] রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ (হইতে) গ্রহণ **করিয়াছেন** কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় **পূর্বকবিগণ** (হইতে) ভিন্ন পথে গমন **করেন নাই**। (বঙ্কিমচন্দ্র : উত্তররচিত : বিবিধ প্রবন্ধ)

মোটা হরফের পদগুলি ক্রিয়া, ( ) বন্ধনীযুক্ত পদগুলি অনুসর্গ এবং [ ] বন্ধনীযুক্ত পদগুলি সর্বনাম। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য মূলত এই পদগুলিতে। এখন উদাহরণ হিসেবে নীচে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য উপরের অনুচ্ছেদ অবলম্বন করে দেওয়া হল।

	সাধু ভাষা	**চলিত ভাষা**
ক্রিয়াপদ	হইয়াছে	হয়েছে
	হয় নাই	হয়নি
	হইতে	হতে
	করিয়া	করে
	করিয়াছেন	করেছেন
	করেন নাই	করেননি।

অনুসর্গ	হইতে	হতে, থেকে
	কর্তৃক	দ্বারা।
সর্বনাম	ইহাতে	এতে
	যাহা	যা
	তাহা	তা
	তাঁহার	তাঁর।

আগেই বলা হয়েছে, শব্দ নির্বাচনে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু শব্দ নির্বাচনে চলিত ভাষায় এত কড়াকড়ি নেই, যেমন রয়েছে ক্রিয়াপদ, অনুসর্গে ও সর্বনাম নির্বাচনে। উদাহারণ হিসেবে বলা যায়, 'সংগ্রহ' এই শব্দটি সাধুতে চলে, এর চলিত রূপ 'জোগাড়'। কিন্তু চলিত ভাষায় 'জোগাড়' এবং 'সংগ্রহ' দুই-ই চলতে পারে অথচ সাধুতে কেবলমাত্র 'সংগ্রহ'ই চলে, 'জোগাড়' চলে না। একটি উদাহরণ দেখুন :

চলিত (১) অনেক কষ্টে আমি বইটা জোগাড় করেছি।

(২) অনেক কষ্টে আমি বইটি সংগ্রহ করেছি।

এবার চলিত ভাষার কয়েকটি নমুনা দেখুন :

(ক) ''অন্ততপক্ষে আমি অবিলম্বে বুঝেছিলুম যে শ্রেণিসংঘর্ষে স্বতঃসিদ্ধি একবার জানলে ভাববিলাসই শ্রমিক-জগতে আমার একমাত্র প্রবেশপথ, এবং সেইজন্যে আমি সর্বদা জানতে চাইতুম সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনি অনিবার্য কিনা।'' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ : মুখবন্ধ) এখানে দেখুন, ''ক্রিয়াপদ'' ছাড়া আর সবই সাধু ভাষার মতো। বিশেষ করে 'তৎসম' শব্দের ব্যবহারে। কাজেই সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কেবলমাত্র 'ক্রিয়াপদে, সর্বনামে এবং অনুসর্গে। তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের ব্যবহার লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় প্রচুর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সমাহার দেখা যায়।

(খ) 'আসল কথা আমি ঘরকুনো, আমি গুছিয়ে বসতে ভালোবাসি, শিকড় গজাতে ভালোবাসি, অনেকদিন বাস করবার ফলে যে ঘরটি আমার ব্যক্তিত্বে একবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তার বাইরে বেশীক্ষণ মন টেকে না আমার। বাঁধাধরা কতগুলো অভ্যাসের দৈনন্দিন দাসত্বে আমার তৃপ্তি। কখনো কোনো কারণে তার একটু বিচ্যুতি হলেও আমার অস্বস্তি লাগে।'' (বুদ্ধদেব বসু : 'পুরোনো পল্টন')

বুদ্ধদেব বসুর এই লেখাও চলিত ভাষায় লেখা। অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি। কিন্তু লেখার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'ব্যক্তিত্ব', 'আচ্ছন্ন', 'দাসত্ব', 'তৃপ্তি', 'বিচ্যুতি', 'দৈনন্দিন' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি আমরা কথা বলার সময়ে ব্যবহার করি না। তবুও লেখার ঢং অনেকটা কথা বলার মতো।

(গ) ''আমার বুকটা ধুক পুক করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন—'কেন থাকুক না—কোন ক্ষতি নেই। 'তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ইয়ে—'আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা বা কফি'?''

(সত্যজিৎ রায় : শেয়ালদেবতা রহস্য : আরো এক ডজন)

সত্যজিৎ রায়ের এই লেখাটি পড়লে মনে হবে যেন কথা শুনছি। এখানে মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য প্রায় নেই। এও 'চলিত ভাষা'।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, চলিত ভাষা মানেই মুখের ভাষা নয়। মনে হতে পারে, কথ্য ভাষার লেখ্যরূপই বুঝি চলিত ভাষা, আসলে তা কিন্তু নয়। উপরের উদাহরণগুলি থেকেই তা প্রমাণিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের লেখাটি ছেড়ে দিলে বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখার যে নমুনা, তাকে কখনওই কথ্য ভাষা বলা যাবে না। আবার বুদ্ধদেব বসুর লেখা কথ্য ভাষার কাছাকাছি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখা কথ্য ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আপনারা বিভিন্ন লেখকের লেখা যখন পড়বেন, তখন তাঁদের লেখার সঙ্গে কথ্য ভাষার পার্থক্য যদি থাকে, তা লক্ষ করবেন।

সারাংশ

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের বাহন ছিল প্রধানত ''সাধু ভাষা''। আজকাল চলিত ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এবং সবরকম কাজকর্ম চলছে চলিত ভাষাতেই। কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষাই উনিশ শতক থেকে সর্বজনগ্রাহ্য চলিত ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পরে তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪.১২ অনুশীলনী-৫

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

১। **ঠিক উত্তরটি বেছে নিন—**

(ক) সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য প্রধানত
(১) বিশেষণ পদের প্রয়োগে
(২) বিশেষ্য ও নির্দেশকের ক্ষেত্রে
(৩) ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গে।

(খ) চলিত ভাষা মূলত
(১) কথ্যভাষার একটি শাখা
(২) গদ্যরীতির একটি শাখা
(৩) মিশ্র ভাষার একটি শাখা।

২। **সাধু ভাষা না চলিত ভাষা লিখুন :**

(ক) আজ ছুটির দিনে বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখছি।

(খ) রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(গ) যাদের অবজ্ঞা করি, তাদের আলগা করে রাখি।

(ঘ) মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী।

(ঙ) ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে।

৪.১৩ সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন।

২। সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ : পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৪। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ—বামনদেব চক্রবর্তী

৫। শব্দ বাক্য পদবিধি—ক্ষুদিরাম দাস

নোটস্

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

মডিউল-২ ❑ বাংলা সাহিত্য : নির্বাচিত পাঠ

একক -১(ক) ❑ ভারততীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.(ক).১ উদ্দেশ্য

১.(ক).২ প্রস্তাবনা

১.(ক).৩ কবিজীবনী

১.(ক).৪ মূল পাঠ

১.(ক).৫ আলোচনা

১.(ক).৬ সারাংশ

১.(ক).৭ অনুশীলনী

১.(ক).৮ সহায়ক গ্রন্থ

১.(ক).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—

- কবিতার ভাষা ও গদ্যের ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আদর্শবোধের পরিচয় পাবেন।
- ছন্দের দোলায় কবিতাপাঠের আনন্দ পাবেন।

১(ক).২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত ও বিখ্যাত কবিতার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবেন। কবিতাটিতে কবি ভারতের ভাষা-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে ভারতবাসীকে এক হয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। ভারতের ইতিহাস যেভাবে শত্রুদেরও আপন করে নিয়েছে, তা মনে রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসী এক হয়ে মিলিত হয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাবে এ যেন কবি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন। কবিতাটি 'গীতাঞ্জলির' কবিতা। তখনকার প্রেক্ষাপটে কবি যুযুধান এবং হিংসাদীর্ণ পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি চিরকালই কোনও ধরনের হিংসা-বিদ্বেষের পক্ষপাতী নন—মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়ে মহামানবের, মহামানবতার জয়গান গেয়েছেন এই কবিতায়। যা বর্তমান যুগের পক্ষেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১.(ক).৩ কবিজীবনী

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ইংরাজি ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ। তিনি বাবা মায়ের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। তাঁর মাতা সারদাদেবী এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'।

স্কুল বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ তিনি শেষ করেননি। ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সালে কবির বিবাহ হয়। বহু গদ্য-প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, গান সারা জীবন ধরে রচনা করেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' তাঁর প্রথম জীবনের কাব্য। এরপর 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ইত্যাদি রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায় 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী', 'মহুয়া'। এরপর তিনি 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্য থেকে গদ্যচ্ছন্দে লিখতে শুরু করেন। 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'-র পর তাঁর শেষপর্বের রচনা 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শেষ লেখা'।

জীবনে অজস্র মৃত্যু পেরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনে প্রথম তাৎপর্যময় মৃত্যু তাঁর বৌঠান কাদম্বরীদেবীর। তারপর পুত্র, পত্নী, কন্যাদের এবং দৌহিত্রকে হারানোর বেদনাও বহন করেছেন। কিন্তু আস্তিক্যবাদী কবি সব মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণবোধেই অধিষ্ঠিত থেকেছেন।

১৯৪১-এর ৭ আগস্ট কবির মৃত্যু হয়।

১.(ক).৪ মূলপাঠ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর

নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শকহুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে-
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে,

দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা।
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে—
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়,
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

১.(ক).৫ আলোচনা

'ভারততীর্থ' কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৬ সংখ্যক কবিতা এবং গানও বটে। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত হন (১৯১৩)। এর আগে থেকেই কবির বিশ্বানুভূতির পরিচয় আমরা পাই। পৃথিবীর সব ঘটনা, বিভিন্ন জাতি ও দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি তাঁর বিশেষ চিন্তা ও বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল।

এই কবিতায় কবি ভারতকে সম মানবের সম্মিলন-ক্ষেত্ররূপে দেখেছেন তাঁর চোখে এই দেশ মহামানবের সাগরতীর। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন, যে জাতি ভারতবর্ষে এসেছে, শত্রুর ভূমিকায় আক্রমণ করেছে ভারত, তারা ধীরে ধীরে ভারতের সভ্যতার আকর্ষণী-শক্তিতে ভারতীয়তে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ শক্তির নিন্দা না করে তিনি বলেছেন, তারা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপহার আনছে। বিভিন্ন শক্তির আগমন ভারতে বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। তার সংহতিতে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধ এই কবিতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সব জাতি তাঁর কাছে 'মানুষ'। কবিতাটিতে জাতীয়তাবোধও আছে। তৎকালীন ভারতের পরাধীনতার নিত্য দুঃখ ও লজ্জাও এই জাতিকে পরাভূত করতে পারেনি। খুব দ্রুত ভারত তার গৌরব পুনরুদ্ধার করবে এই আশা তিনি প্রকাশ করেছেন।

তিনি সারা বিশ্বের কাছে পুণ্যতীর্থ ভারতের গৌরবময় ছবি তুলে ধরে সারা পৃথিবীর মানুষকে সেখানে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সমিল এই কবিতাটির মিশ্র কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের দোলা কবিতাটির ভাবের সঙ্গে একাত্ম হতে আমাদের সাহায্য করেছে।

১.(ক).৬ সারাংশ

'ভারততীর্থ' কবিতাটি আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি কবিতাটির মধ্যে কবি কী বর্ণনা করেছেন।

এই কবিতাটিতে কবি প্রথমে ভারতবর্ষের সব রকম ভাষা-ধর্ম-জাতির মানুষের সহ-অবস্থানের বর্ণনা করেছেন। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চিন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল—পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে নানারকম লোক এসে এক মহান দেশের সৃষ্টি করেছে। সকলের সমান ঐক্য চেষ্টায় এক বিরাট ভারতীয় সভ্যতা গঠিত হয়েছে। এই বিরাট সভ্যতার গঠনে এদের সকলের অবদান সমান। আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ—সকলকেই কবি আহ্বান করেছেন, সব তুচ্ছ বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় এই মহান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর মহিমাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগে আরও গৌরবান্বিত করে তুলতে।

এই কবিতাটির ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রতি পঙ্‌ক্তি যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষ শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিগত মিল পাওয়া যায়। তৃতীয় ভাগের শেষ শব্দটি পরের পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দটির সঙ্গে মেলে। যেমন—

১	২	৩
তপস্যা বলে	একেরে অনলে	বহুরে আহুতি দিয়া
১	২	৩
বিভেদ ভুলিল	জাগায়ে তুলিল	একটি বিরাহ হিয়া

মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে এই কবিতাটির ছন্দ আপনাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

১.(ক).৭ অনুশীলনী

এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১। 'ভারততীর্থ' কবিতাটিতে এমন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যা গদ্যে অথবা কথ্যভাষায় আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না। যেমন—'হেথায়'। সাধারণত কথা বলার সময় যদি আমরা 'এখানে' না-বলে 'হেথায়' বলি, তাহলে সেটা খুবই অস্বাভাবিক শোনায়।

নীচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। কবিতাটি থেকে তাদের 'কাব্যিক' রূপ/প্রতিশব্দ খুঁজে বের করুন :

(ক) আমরা ______

(খ) দেখো ______

(গ) নয় ______

(ঘ) সেখান ______

(ঙ) থেকে ______

(চ) হৃদয় ______

(ছ) ছোঁয়ায় ______

(জ) মিলতে ______

(ঝ) গেয়ে ______

(ঞ) বয়ে ______

২। **নীচে কয়েকটি কঠিন শব্দ দেওয়া হল। তাদের সহজ প্রতিশব্দ দিন :**

(ক) অনল ______

(খ) নিত্য ______

(গ) শোণিত ______

(ঘ) তন্ত্রে ______

(ঙ) নীড় ______

(চ) বিপুল ______

(ছ) ত্বরা ______

(জ) রজনী ______

(ঝ) দ্বার ______

(ঞ) ভূধর ______

৩। **অনেক সময় দুটি শব্দ মিলিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হয়। যেমন—**

গঙ্গার + জল = গঙ্গাজল।

'গঙ্গার জল'—এ দুটি শব্দের যা অর্থ, 'গঙ্গাজল' শব্দেরই সেই একই অর্থ। ব্যাকরণে দুটি বা তার চেয়ে বেশি শব্দের এরকম মিলনকে 'সমাস' বলে। নীচে এই কবিতা থেকে নেওয়া কয়েকটি সমাসবদ্ধ শব্দ দেওয়া হল। এই শব্দগুলির সমাস ভেঙে তাদের অর্থ লিখুন।

(ক) জয়গান।

(খ) সাগরতীরে।

(গ) ভারততীর্থ।

(ঘ) রক্তশিক্ষা।

(ঙ) মঙ্গলঘট।

(চ) মরুপথ।

(ছ) তপস্যাবল।

৪। **নীচে দেওয়া শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করুন :**

(ক) মহৎ যে মানব

(খ) নবরূপ দেবতা

(গ) জপের মালা

(ঘ) যার শির আনত

(ঙ) অপমানের ভার

(চ) যাকে পবিত্র করা হয়েছে।

১.(ক).৮ সহায়ক গ্রন্থ

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ) : সুকুমার সেন।

একক -১(খ) ❑ আবার আসিব ফিরে—জীবনানন্দ দাশ

১.(খ).১ উদ্দেশ্য
১.(খ).২ প্রস্তাবনা
১.(খ).৩ কবিজীবনী
১.(খ).৪ মূল পাঠ
১.(খ).৫ আলোচনা
১.(খ).৬ সারাংশ
১.(খ).৭ অনুশীলনী
১.(খ).৮ সহায়ক গ্রন্থ

১.(খ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—

- কবি জীবনানন্দ দাশের কবি জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে।
- জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে জানা যাবে।

১.(খ).২ প্রস্তাবনা

কবি জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯-১৯৫৪) আধুনিক বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বললে বোধহয় বেশি বলা হয় না। অবশ্য আধুনিক যুগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আপেক্ষিক। মধুসূদন দত্ত তাঁর সময়ে ছিলেন সর্বাধুনিক কবি। এরপর এলেন রবীন্দ্রনাথ যিনি সর্বকালে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সময়ের সর্বাধুনিক কবি। এবং এরপরে এলেন রবীন্দ্র-বিরোধী কবি-সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথের মতে নদী যেমন বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়—'সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার নিজেকে ভেঙেছেন ও গড়েছেন এবং আধুনিক হয়ে উঠেছেন।

বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) পরবর্তী অবস্থা, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, বর্তমান জীবনে যান্ত্রিকতা, ক্লান্তি, নৈরাশ্যবোধ, হতাশা, মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাবের দিকে। কবিরা খুব সচেতনভাবে চেয়েছিলেন বিশ্বের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করতে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ফলে তাঁদের মধ্যে এসেছে সাম্যবাদী চিন্তাধারা। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার

তথা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বর্তমানের প্রতি মানুষের সংশয় তৈরি করেছে। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে এসেছে অনাস্থা। পরিবর্তে দেহজ প্রেম ও ভোগবাদ স্থান করে নিয়েছে জীবনে। এইসব পরিবর্তনের সাহায্যেই কবিরা সচেতনভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণ করেই এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। প্রথমে এলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিরা এবং পরে এলেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তী। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়' ইত্যাদি সাহিত্যপত্র ছিল এঁদের মুখপাত্র। এঁরা সকলেই বাংলা কবিতায় স্বাতন্ত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছেন।

১.(খ).৩ কবিজীবনী

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে, বরিশাল শহরে। তাঁর পিতামহ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কবির পিতা সত্যানন্দ নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতা কুসুমকুমারী বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তিনি কবি ছিলেন এবং গানও জানতেন। জীবনানন্দ ১৯১৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজি অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর সিটি কলেজে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন।

জীবনানন্দের কর্মজীবন নানা উত্থান-পতন পরিকীর্ণ। তিনি বারবার চাকরিতে যোগ দিয়েছেন এবং নানা কারণে কর্মচ্যুত হয়েছেন। অনেকবার, অনেকদিন বেকারত্ব ভোগ করেছেন। এমনকি বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করেছেন, বীমার এজেন্টের কাজও করেছেন। লাবণ্য দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর পাঁচ বছর বেকারত্ব ভোগ করেছেন। অবশেষে তিনি হাওড়া গার্লস্ কলেজে চাকরি পান এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। অন্যমনস্ক অবস্থায় ল্যান্সডাউন ও রাসবিহারী রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে চাপা পড়েন এবং ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র ব্রহ্মবাদীতে জীবনানন্দের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার সংখ্যা ৫৯৯টি (সংগৃহীত)। তাঁর রচিত কাব্যসমূহ :

(১) ঝরাপালক (১৩৩৪)
(২) ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৩৪৩)
(৩) বনলতা সেন (১৩৪৯)
(৪) মহপৃথিবী (১৩৫১)
(৫) সাতটি তারার তিমির (১৩৫৫)
(৬) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৬১)

(৭) রূপসী বাংলা রচনাকাল (১৯৫৭) (৮) বেলা অবেলা কালবেলা (১৩৬৮)
(৯) সুদর্শনা (১৩৮০) (১০) মন বিহঙ্গম (১৩৬৮)
(১১) আলো পৃথিবী (১৩৮৮) প্রভৃতি।

১.(খ).৪ মূলপাঠ

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়;
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খই-এর ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকার আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।"

১.(খ).৫ আলোচনা

আবার আসিব ফিরে কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' কাব্যের (১৯৩২-এ রচিত) কবিতা। কবিতাটি মৃত্যু ও জন্মান্তরের কারুণ্যে গাঁথা। কর্মহীন জীবনে যখনই জীবনানন্দ বরিশালে যেতেন, তিনি তাঁর আশেপাশে ছেলেবেলার অতি পরিচিত গ্রামবাংলার সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান অনুভব করতেন। এবং এই মনোভাবে আক্রান্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি প্রায় একশোটি কবিতা রচনা করেন। যার অধিকাংশই চোদ্দ লাইনের সনেট। তখনকার ধূসর মানসিকতায় তিনি এর নামকরণ করতে চেয়েছিলেন—'বাংলার ত্রস্ত

নীলিমায়'। তাঁর মৃত্যুর পর এর থেকে বাছাই করে ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'রূপসী বাংলা'।

কবিতাটির প্রথম আটটি পংক্তিতে কবি নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন, পরের ছয়টি পংক্তিতে পাঠকেরা কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁকে অনুভব করবে, তা বলেছেন। বাংলা সুপরিচিত পাখিদের অর্থাৎ শঙ্খচিল, বক, শালিক ইত্যাদির স্বাধীন প্রজন্মের মধ্যে তিনি আবার বেঁচে উঠতে চেয়েছেন। মনুষ্যজীবনের হতাশা, গ্লানি তুচ্ছতার চেয়ে এই মুক্ত জীবন তাঁর প্রার্থিত বলে মনে হয়েছে।

পরবর্তী অংশে, পাঠকের সৌন্দর্যতৃষ্ণার অন্তরে তিনি থেকে যাবেন বলে মনে করেছেন। সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শনের ওড়া, শিমুলের ডালে লক্ষ্মীপেঁচার ডাক ইত্যাদির মধ্যে যে রহস্যানুভূতি, তা পাঠকের মনে যেন ছড়িয়ে থাকে। একেবারে প্রাত্যহিক দৃশ্য—উঠোনে শিশুর ধান ছড়িয়ে খেলা, বা, কিশোরের খেলাচ্ছলে ডিঙি বাওয়া—এ সবের মধ্যেই তিনি থাকবেন। আবার, রাঙা মেঘ সাঁতরে সন্ধ্যা নামার মুখে বকের উঠে আসা— এই অসাধারণ চিত্রের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব পাঠক যেন অনুভব করে।

জীবনানন্দের কাব্যে মৃত্যুচেতনা খুব স্পষ্ট এবং ব্যাপক। 'রূপসী বাংলায়' এই মৃত্যুচেতনা খুব স্পষ্ট—প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই। 'কুয়াশার বুকে ভেসে' জলাঙ্গীর সবুজ করুণ ডাঙায় তিনি আসতে চেয়েছেন। 'মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকার আসিতেছে নীড়ে' এই বর্ণচ্ছটার পশ্চাতের অন্ধকারই কবির কাছে সত্য। জীবনানন্দের কবিতার ইন্দ্রিয়ঘনত্ব (senselessness) এবং চিত্রকল্প রচনার নৈপুণ্য—কল্মীর গন্ধ ভরা জলে হাঁসের সারাদিন কেটে যাওয়া, রাঙা মেঘ সাঁতরিয়ে অন্ধকারের ভেসে আসা—একেবারে আমাদের প্রত্যক্ষতার স্বাদ এনে দিয়েছে। 'ছড়াতেছে', 'উড়িতেছে', 'ডাকিতেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি দেশজ শব্দ ব্যবহারে আমরা প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাই—বাংলার পরিচিত শব্দাবলী এবং দৃশ্যের সাহাযেও এ বিষয়টি স্পষ্ট। লক্ষণীয়, কবিতাটি কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই। কবি কমা, সেমিকোলোন ও ড্যাশের সাহায্যে তাঁর অনুভূতির প্রবহমানতাকে প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ একান্তই এবং বিশিষ্টভাবে রোমান্টিক। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'জীবনানন্দের সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত।' ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনা মিশে তাকে পদে পদে অপ্রত্যাশিত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। তাঁর কবিতা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল। তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—প্রথমে দৃষ্টি পরে স্পর্শ। তাঁর কবিতায় প্রচুর উপমা এবং উপমাগুলি জটিল ও দুরবগাহ। ভাবকে তিনি কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি দিয়ে প্রকাশ করেন। এত সুন্দর সার্থক রোমান্টিক কবিতা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে দুর্লভ।

শব্দ টীকা : ধানসিড়ি — বর্তমান বাংলাদেশের একটি নদী। ঝালকাঠি (বরিশাল) জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এখন ক্ষীণকায়। এর উৎস আড়িয়াল খাঁ নদ। এটি সুগন্ধা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জীবনানন্দের কাব্যে বার বার এই নদীর নাম রয়েছে।

রূপসা — বাংলাদেশের খুলনা জেলা দিয়ে প্রবাহিত নদী। এর উৎস ভৈরব নদ। এটি কাজিবাছা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১.(খ).৬ সারাংশ

মৃত্যুর পর কবি আবার বাংলাতেই ফিরতে চেয়েছেন। যদি মনুষ্যেতর প্রাণী হয়ে জন্মাতে হয়, তাও। হয়তো শঙ্খচিল বা শালিক, হয়তো সুদর্শন বা লক্ষ্মীপেঁচা। বাংলার পরিচিত দৃশ্য—শিশুর খই ছড়ানো, কিশোরের ডিঙা বাওয়া, অন্ধকার নেমে আসা, বকের নীড়ে ফেরা বলার এই সুপরিচিত দৃশ্যের মধ্যেই কবি তাঁর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

১.(খ).৭ অনুশীলনী

১। বিশদ করে বলুন :

(ক) জীবনানন্দ পরজন্মে কী কী হয়ে জন্মাতে চেয়েছেন?

(খ) পাঠক কী কী বস্তুর মধ্যে জীবনানন্দকে অনুভব করবেন বলে তিনি আশা করেছেন?

(গ) 'আবার আসিব ফিরে...' কবিতাটিতে কয়টি পংক্তি আছে? এর প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের ভাববস্তু কী? সংক্ষেপে লিখুন।

২। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

ধানসিড়ি নদী, রূপসা নদী।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

হয়তো ভোরের ________ হয়ে ________ ________ দেশে
________ ________ রহিবে লাল পায়।
সারাদিন কেটে যাবে ________ ________ ________ জলে
________ ________ সাঁতরায়ে ________ আসিতেছে নীড়ে।

১.(খ).৮ সহায়ক গ্রন্থ

১। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী।

২। একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু।

একক ২ ❑ প্রবন্ধ (‘পতঙ্গ’, ‘লাইব্রেরি’)

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ বঙ্কিমের জীবন ও প্রবন্ধ পরিচয়
২.৪ মূলপাঠ— পতঙ্গ-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২.৫ সারাংশ—১
২.৬ অনুশীলনী—১
২.৭ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচিত প্রবন্ধসমূহ
২.৮ মূলপাঠ— লাইব্রেরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২.৯ সারাংশ— ২
২.১০ অনুশীলনী—২
২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে, প্রবন্ধ সাহিত্য রচনার—

(১) দুটি যুগ সম্পর্কে জানা যাবে।

(২) দুজন প্রাবন্ধিকের রচনারীতির পার্থক্য সম্পর্কে জানা যাবে।

(৩) দুজনের গদ্যরীতির পার্থক্য সম্পর্কে জানা যাবে।

২.২ প্রস্তাবনা

‘প্রবন্ধ’ শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট বন্ধন। প্রাচীন কালে ‘প্রবন্ধ’ শব্দটিকে সাহিত্যের যেকোনো রূপ সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হত। যেমন, কাব্যপ্রবন্ধ বা নাট্য প্রবন্ধ। ‘রচনা’ শব্দটি সংস্কৃতের মত বাংলাতেও এখন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, নাট্যরচনা, প্রবন্ধরচনা ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রবন্ধ। ইংরাজীতে ফরাসী লেখক মতেঁন (Montaigne) একটি বিশেষ অর্থে essay শব্দটির প্রয়োগ করেন। তারপর থেকে যুক্তিনিষ্ঠ বা জ্ঞানগর্ভ রচনা ‘প্রবন্ধ’ নামে পরিচিত হতে থাকে। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের অন্যান্য অনেক form-এর মতো মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাময়িক পত্রের আবির্ভাব প্রবন্ধ রচনার প্রসারের কারণ ছিল। আর একটি কারণ ছিল রামমোহনের যুগের ধর্ম নিয়ে কলহ।

বাংলা সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখকগণ প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন, কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। প্রবন্ধকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি বিষয়গৌরবী বা Objective আর একটি আত্মগৌরবী বা Subjective। বাংলা সাহিত্যে এই দুটি ধারার রচনাই একসঙ্গে পরিপুষ্ট হতে শুরু করে। বাঙালির সাংস্কৃতিক মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল হল তার প্রবন্ধসাহিত্য। রামমোহনের সময়ের পর অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এর পরই সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সব্যসাচীর মতো সাহিত্যক্ষেত্রে জঞ্জাল পরিষ্কার করেন এবং সাহিত্য রচনার নূতন পথ প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৭২) আষাঢ়ের নবমেঘের মত— 'সমাগতোরাজবদ্দুন্নতধ্বনি:'।

এরপর সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। মোটামুটি ১৮৯১ থেকে প্রবন্ধ রচনা শুরু করে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত বহু পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লেখেন এবং বহু পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা, যেমন সাহিত্য বিষয়ক, লোকসাহিত্য বিষয়ক, জমিদারদের অত্যাচার, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পাদনা করেন, 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভান্ডার' ইত্যাদি পত্রিকা।

রবীন্দ্র-যুগের পরেও বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার ধারা অব্যাহত। রবীন্দ্রযুগে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ চৌধুরী প্রমুখ প্রাবন্ধিকেরা নিজের মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরও পরে মোহিতলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় ইত্যাদি প্রাবন্ধিক নিজেদের উৎকর্ষ প্রমাণ করেছেন।

২.৩ বঙ্কিমের জীবন ও প্রবন্ধ পরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৬শে জুন, ১৮৩৮ খ্রীঃ। পিতার নাম যাদবচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ সালে বি. এ. পাশ করে যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ১৮৬০ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি হয়। Rammohan's wife নামে একটি ইংরেজি উপন্যাস লেখা শুরু করলেও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র বিশুদ্ধ সহিত্যচর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেননি। তিনি চিন্তানায়ক, মনীষী। সুতরাং বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের হিত কীভাবে করা সম্ভব, তা ভাবতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকেও বিসর্জন দিয়ে শেষ জীবনে শুধু প্রবন্ধই লেখেন। তার বিশিষ্ট উপন্যাসগুলি হল 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় খণ্ড), 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলকান্তের দপ্তর' আত্মগৌরবী (subjective) প্রবন্ধ তথা রম্যরচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রম্যরচনার কোনো বাঁধাধরা রচনারীতি নেই। লেখকের মর্জি অনুসারে এখানে তুচ্ছ বা মহৎ বিষয় নিয়ে এটি রচিত হতে পারে। রসিকতাপূর্ণ মেজাজে কমলাকান্ত-র জবানীতে লেখক কখনও খুবই গুরুতর বিষয় কখনও শুধুই নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ডি. কুইন্স রচিত 'Confession of an English opium Eater' এর আদর্শে তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনা করেন এবং আজ পর্যন্ত এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্যরচনার সংকলন। আমাদের পাঠ্য 'পতঙ্গ' প্রবন্ধটি কমলাকান্তের দপ্তরের একটি বিশিষ্ট রচনা।

২.৪ মূলপাঠ

পতঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাবুর বৈঠকখানার সেজ জ্বলিতেছে— পাশে আমি মোসায়েবি ধরনের বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন, আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহন করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটি পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ''চোঁ-ও-ও-ও'' 'বোঁ-ও-ও'' করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গে ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম— কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, ''তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।'' তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম— শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, ''আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি— তুমি চুপ কর।'' আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে— পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে— আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ— আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই— প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে— আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গ-জাতি, পুর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি— কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ— আমাদের সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না— আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক, —আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ— আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?— লইয়া কি করিব?— নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি— তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট— আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম— তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছু নাই— তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ— কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমার দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না— আমি জানি না— কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু— আমার জাগ্রতের ধ্যান— নিদ্রার স্বপ্ন— জীবনের আশা— মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না— জানিতে চাহিও না— যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক— আমি ছাড়িব না— আবার আসিতেছি— বোঁ-ও-ও।

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল— চাহিয়া দেখিলাম— বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না— দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল — আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে— সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে— কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই— মোহিতে হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই— কই, তাহা ত পাই না— আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই— আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,— আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন— জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ, "আন্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত," ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তর হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

২.৫ সারাংশ-১

বাবুর (নসীরামবাবুর) বৈঠকখানায় কমলাকান্ত আফিম চড়িয়ে ঝিমোচ্ছিলেন এবং ঝিমোতে ঝিমোতে দেখলেন, একটি পতঙ্গ তাঁর চারপাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তারা বলেছে, তারা আলোর সঙ্গে কথা বলছে।

কমলাকান্ত কান পেতে শুনলেন, তারা বলছে— তাদের অধিকার নষ্ট করা হয়েছে, তাদের ডোমের (কাচের) ভিতর ভরা হয়েছে। তাদের স্বচ্ছন্দে পুড়ে মরার পথ নেই। তারা হিন্দুর মেয়ে নয় যে, সহমরণ প্রথা বন্ধ করে তাদের পুড়ে মরার পথ বন্ধ করা হয়েছে। পুড়ে মরতে না পারলে তাদের জীবনের কোনো সার্থকতা নেই।

নসীরামবাবুর ডাকে চেতনা পেয়ে কমলাকান্ত নসীরামবাবুকে একটি বড় পতঙ্গরূপে দেখতে পেলেন। তখন তাঁর মনে হল মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ, সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে, সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়ে মরতে চায়। কাচ অর্থাৎ বাধা না থাকলে সংসারে সকলেই পুড়ে মারা যেত। জ্ঞান বহ্নিতে সক্রেটিস গ্যালিলিও দগ্ধ হলেন, মান বহ্নিতে দগ্ধ হলেন দুর্যোধন, জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost' ধর্ম-বহ্নির বলি সেন্ট পল, ডোপ-বহ্নিতে অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা দগ্ধ হয়েছেন, রূপ বহ্নিতে 'রোমিও-জুলিয়েট', ঈর্ষা বহ্নিতে 'ওথেলো' দগ্ধ হয়েছেন। 'গীতগোবিন্দ' ও 'বিদ্যাসুন্দরে' ইন্দ্রিয় বহ্নি জ্বলছে।

মানুষ জানে না, বহ্নির প্রকৃত অর্থ কী? এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুই হার মানে। মানুষ পতঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। অজানা বহ্নির চারিদিকে তারা ঘুরেই মরে।

বিশ্লেষণমূলক আলোচনা :

পতঙ্গ প্রবন্ধটি পুরোপুরি আত্মগৌরবী প্রবন্ধ। 'কমলাকান্তের দপ্তরের বেশ কিছু প্রবন্ধে দেশহিতের কথা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ; কিন্তু 'পতঙ্গ' একেবারে স্বতন্ত্র— বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মনের স্বগতোক্তি। অথচ, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মনুষ্যজীবনের গভীর তত্ত্ব এবং আত্মজিজ্ঞাসা।

মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ— এই ভাবনার কারণগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য তির্যকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানুষের অন্তরস্থিত বাসনা, যা তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তার পূর্ণ পরিচয় কখনো পাওয়া যায় না। পূর্ণ নিবৃত্তিও কখনও হয় না। জ্ঞানের রূপের, মানের, প্রতিপত্তির ধর্মের আকাঙ্খা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যদি তারা নানা বাধার দ্বারা নিবৃত্ত না হত, তাহলে মৃত্যু ছাড়া তাদের আর উপায় থাকত না। মানুষ সারা জীবন অন্বেষণ করে এবং অন্বেষণ ফুরিয়ে গেলে মানুষের জীবন নিরর্থক হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে মনুষ্যজীবনে এই বহ্নির প্রভাব দেখানো হয়েছে। মানুষ 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' (কালিদাস), যা চায়, বেশির ভাগই লোকই তা পায় না। সেই গভীরতা, সেই তাড়না, সেই মানসিক দৃঢ়তা সকলের থাকে না। তাই তারা সাধারণ মানুষের মতো ডোমের চারপাশে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়।

শেষে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তা মনুষ্যজীবনের শেষ কথা। আমরা কিছুই জানি না, জানতে চাই কিন্তু পারি না। এখানে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মপুস্তক, কাব্যগ্রন্থ, সবকিছুই হার মানে। সাধু গদ্যে, অসাধারণ মনোজ্ঞ লঘু ভঙ্গিতে জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সম্পর্কে সারকথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন।

২.৬ অনুশীলনী-১

(ক)

(১) কমলাকান্ত কোথায় বসেছিলেন?

(২) তুমি 'বিশ্বধ্বংসক্ষম' কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?

(৩) নসীরামবাবুকে কমলাকান্ত কী রূপে দেখেছিল?

(৪) জ্ঞান বহ্নির পতঙ্গ কাদের বলা হয়েছে?

(৫) ভোগ বহ্নির পতঙ্গ কারা?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(১) আমরা গরিব পতঙ্গ _______________ আমাদের উপর।

(২) তুমি যে _____________ কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

(৩) সকলেরই এক একটি ____________ আছে।

(৪) কেবল জানি যে তুমি আমার __________ বস্তু __________।

(৫) দেখ ভাই _________ _________ ঘুরিয়া কোন ফল নাই।

২.৭ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচিত প্রবন্ধসমূহ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর গদ্যরচনার পরিমাণ বিপুল এবং রচনার বিষয়ও বিচিত্র। গল্প-উপন্যাস তো বটেই, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, আত্মজীবনী, এমনকি বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্বও তাঁর রচনার মধ্যে পড়ে। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায়, ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায়— এতে ছিল সেই সময়ে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত কবি, কিন্তু কবিতা যদি তিনি নাও লিখতেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী হয়ে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হতেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিঃ)। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিঃ থেকে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল এবং মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর গদ্যরচনার শুরু ১২৮৩ খ্রিঃ থেকে।

পড়াশুনার জন্য মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বিলেতে পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো পাঠক্রম শেষ না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮৯৮৩ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খ্রিঃ ১৯শে এপ্রিল তাঁর ন'দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়— এই আঘাত তিনি ভুলতে পারেননি। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারী দেখাশুনার জন্য শিলাইদহতে পাঠান। এই গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যজীবনে অনেক সোনার ফসল ফলিয়েছে। কলকাতায়

ফিরে আসার পর ১৯০১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেনা জমিতে গড়ে তোলেন 'বিশ্বভারতী' এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯১৩ সালে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৪১ সালের ২২শে শ্রাবণ তাঁর প্রয়ান ঘটে।

খুব অল্পবয়স থেকে প্রবন্ধ রচনা শুরু করে তিনি প্রায় ৪০টি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'জীবনস্মৃতি', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'ছেলেবেলা', 'ছিন্নপত্র', 'য়ুরোপ', 'প্রবাসীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি'— ইত্যাদি। এছাড়া অনেক প্রবন্ধ বিচ্ছিন্নভাবে আছে। যেমন 'সভ্যতার সংকট', 'সমবায়নীতি', 'বাতায়নিকের পত্র' ইত্যাদি।

আমাদের পাঠ্য প্রবন্ধ 'লাইব্রেরী' তাঁর সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধগুলির অন্যতম এবং 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধগুলির রচনাকাল মোটামুটি ১২৯১ খ্রিঃ থেকে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রকাশকাল ১৯০৭ খ্রিঃ। এই সংকলনটি ব্যক্তিগত বা Subjective প্রবন্ধের অন্তর্গত।

২.৮ মূলপাঠ

লাইব্রেরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শে কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— কত শতশত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন 'তোমরা সকলের অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজের আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই। জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে।

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে। আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাত্রেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব।

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

২.৯ সারাংশ-২

লাইব্রেরীর মধ্যে শত সহস্র মানুষের শত সহস্র যুগের ভাবনা সঞ্চিত এবং নিশ্চুপ হয়ে আছে। তারা

শব্দের বন্ধনে গাঁথা। অনন্ত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে যেন কাগজে মুড়ে রেখেছে। সে সাঁকো তৈরি করেছে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে।

এই মহাসংগীতের মধ্যে বাংলার কোনো সংগীত নেই, এই বিষয়টি প্রাবন্ধিককে ক্ষুন্ন করেছে। বাঙালি অসীম কালের এই সঞ্চয়ে নিজের কোনো আদান রাখতে চেষ্টা করছে না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে নিজেকে বুলে থাকছে। অবশ্য এই মনোভাব পরিবর্তনের আশা জাগছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

আলোচনা : এটি একটি আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ। আত্মনিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ উভয় জাতীয় রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ। এক্ষেত্রে চলিত, সাধু—দুই ধরনের গদ্যই তিনি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য তাঁর উপমাপ্রয়োগে। তাঁর বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা উপমাই হয়ে ওঠে বক্তব্য। 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধের প্রথম অংশের রচনায় আমরা দেখি, শুধু উপমার প্রয়োগে অনেকখানি বক্তব্যকে একটি কঠিন বন্ধনে ঘনীভূত করে তোলা হয়েছে। এখানে কল্পনার অসাধারণত্ব যেমন একটা বিস্ময় সৃষ্টি করে তেমন বক্তব্যের ভিতরে প্রতিপদে ইঙ্গিত এসে অর্থকে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যায়। কল্পনাশক্তির অনন্যতা এই রচনাটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

নীরব সমুদ্রকল্লোলের মত লাইব্রেরী শত সহস্র মানুষের চিন্তাকে নিজের মধ্যে সংহত করে রেখেছে। হিমালয়ের মাথার বরফ জমাট, কিন্তু তা যেমন মুহূর্তের মধ্যে বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে দিতে পারে, লাইব্রেরীই তেমন মানুষের ভাবনাকে অক্ষরের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। এই ছবিগুলি ছাড়া এই ভাবনাকে প্রকাশ করাই যেত না। মানুষের নিত্য বহমান চেতনাকে লাইব্রেরী ধরে রেখেছে। এখানে জ্ঞান আহরণের কোনো সীমা নেই। একটু ব্যঙ্গ সহকারে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালি সারা পৃথিবীর এই গচ্ছিত রাখা ভাবনায় নিজের ভাবনা যোগ করতে পারল না। তবে, শেষে একটু আশার কথাও তিনি বলেছেন। সমুচ্চ কল্পনা দ্বারা রচনাটি শুরু করে রবীন্দ্রনাথ শেষে তাঁর দেশহিতচিন্তার সঙ্গে একে মিলিয়ে দিয়েছেন। যুক্তিজাল বিস্তার করে নয়, কাব্যিক গদ্যে এবং মধুর ব্যঙ্গের সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

২.১০ অনুশীলনী-২

(ক) (১) লাইব্রেরী ব্যক্তিগত না বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ?

(২) লাইব্রেরীতে কী বস্তু সঞ্চিত থাকে?

(৩) লাইব্রেরী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ আছে কেন?

(খ) চলিত ভাষায় লিখুন :

(১) এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই।

(২) মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

(৩) জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে।

২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

(১) বাংলা সাহিত্যে গদ্য— ড. সুকুমার সেন

(২) বঙ্কিমচন্দ্র— সুবোধ সেনগুপ্ত

(৩) বঙ্কিম রচনাবলি— সাহিত্য সংসদ

(৪) বাঙলা সাহিত্যের একদিক— শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(৫) রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি— অবন্তীকুমার সান্যাল

(৬) বাংলা সাহিত্যের একদিক— শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(৭) রবীন্দ্রজীবনী— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

একক ৩ ❑ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি : বর্তমান ভারত— স্বামী বিবেকানন্দ

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ মূলপাঠ—১

৩.৪ সারাংশ—১

৩.৫ অনুশীলনী—১

৩.৬ মূলপাঠ—২

৩.৭ সারাংশ—২

৩.৮ অনুশীলনী—২

৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি —

- ভারতবর্ষের পরিবর্তনের ধারাকে স্বামীজির আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

মূলপাঠটি স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'বর্তমান ভারত'-এর 'শূদ্র জাগরণ' , 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' এবং 'স্বদেশমন্ত্র' নামক অনুচ্ছেদ থেকে গৃহীত। স্বামী বিবেকানন্দকে কেউ সাহিত্যিক বলে দাবি না করলেও তিনি যে অল্পসংখ্যক বাংলা রচনা লিখে গেছেন, তাতেই নতুন একটা বাংলা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয়েছে। 'বর্তমান ভারত' এর বিষয় হল পুরোনার সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, নতুনের সারংশ গ্রহণ ও পুরোনোর সারাংশ রক্ষার দ্বারা বর্তমান ভারতকে সৃষ্টি করা। তিনি একদিকে যেমন নতুনকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতেও শাশ্বত অংশকে রক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন। নির্বিচারে নতুনকে গ্রহণ করা ও নির্বিচারে পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রাখা দুই-ই বিপজ্জনক। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ই ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর।

৩.৩ মূলপাঠ-১

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যালয়ের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির

আধার— প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্তাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহণের দ্বারা শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্তাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এখানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল ইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি— সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক-জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, যুব-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত, স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার সহকারিত্ব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বর্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেন-তেন-প্রকারেন উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি। আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্ম্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পর্ণদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্ব্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই, সকল কার্য্যেই ভ্রম প্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিতহয়, অতপথ তাহারই প্রাপ্য।

বৃক্ষ ভুল করে না; প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকূলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবাদ্দর জন্য ব্যস্ত। দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতিবিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিতে শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নেই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্ম্মিত হয় এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজতি জাতিতেস্ববেশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত য়াহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পৌল (St. Paul) কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবৃদ্ধি আছে এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্য্যাবর্ত্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিত সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্নজাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ সাধারণেরমনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজজাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন-তেন প্রকারেন ভারতে ইংলন্ডধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরুক রাখা। এই বুদ্ধির প্রবাল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতি বলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরুক বিজ্ঞান সহায় বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে সর্ব্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয় ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজ থাকিবে এমন ভারতরাজী শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জ্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ

১. রোমক সম্রাট সীজার

সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব-ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এসকল গুণের প্রাবল্যসত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণের নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

৩.৪ সারাংশ-১

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। ইংরেজ শাসনের নাগপাশে পরাধীন ভারত যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত তখন লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ইংরেজ শাসন, ইংরেজ জাতির উপস্থিতি ও ইংরেজি সংস্কৃতি ভারতের পক্ষে পুরোপুরি অকল্যাণকর হয়নি। যে জাতি দীর্ঘকাল এক অচেতনাতার মধ্যে বাস করেছে তাদের ধীরে ধীরে জাগরিত করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজাতীয় ভাবের সঙ্গে প্রাচীন স্বদেশীয় ভাবের সংঘর্ষের এক বিশেষ মূল্য রয়েছে। এই বিজাতীয় শাসনে এদেশের প্রজাবৃন্দ হয়তো পুরোপুরি উপেক্ষিত নয়। সামান্য দু-একজন ভারতবিদ্বেষী ইংরেজের ঘৃণা দিয়ে সম্যক অবস্থার বিচার সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষেত্রবিশেষ পরস্পরের প্রতি এর চেয়ে বেশি ঘৃণা ও অসদ্ভাব লক্ষ করা যায় যেটা দেশের একতা সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক নয়। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা ও জাগরণের সৃষ্টি না হয়, তবে শক্তিমান ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে-কোনো উপায়ে দখলে রাখবার চেষ্টা করবে এবং ইংরেজের জাতিগত বিশেষ গুণগুলি যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন হয়তো তারা এদেশ শাসন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা থেকে লেখকের আশা এই যে, বৈশ্যকুল অর্থাৎ এই বণিক জাতি ভারতের শাসনক্ষমতা লাভের পর সাধারণ প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইছে। প্রজারাই হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার আধার। প্রজাশাসক বা রাজা যখন প্রজাদের থেকে দূরে সরে যায়, তাদের অবহেলা করে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলে ভাবতে থাকে, তখন প্রকৃতই সে দুর্বল হয়ে পড়ে। যেহেতু ইংরেজের মধ্যেও সেই ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে, সেই কারণে হয়তো ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ (প্রজা) অর্থাৎ শূদ্রকুলের হাতে তারা নিজেদের পরাজয়ের পথ তৈরি করছে।

৩.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(১) নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি 'ঠিক' না 'ভুল' তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) প্রজারাই সমাজ-নেতৃত্বের মূলশক্তি	☐	☐
(খ) লেখকের মতে, বর্তমান (ইংরেজ) শাসনপ্রণালীতে কোনো দোষ নাই	☐	☐
(গ) লেখকের মতে, স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক স্বার্থ।	☐	☐

(ঘ) লেখক দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন ☐ ☐

(ঙ) লেখকের মনে কঠিন নিয়মের ফলে দেশের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ☐ ☐

(২) নীচের প্রশ্নগুলির জন্য ডানদিকে দেওয়া সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) দেশের নেতৃসম্প্রদায় দুর্বল হয়—
(১) নিজেদের মধ্যে কলহের দ্বারা
(২) প্রজাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে
(৩) শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা।

(খ) বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যখন—
(১) রাজতন্ত্র বিজিত জাতিকে শাসন করে।
(২) স্বেচ্ছাচারী সম্রাট বিজিত জাতিকে শাসন করে।
(৩) প্রজা নিয়মিত রাজা ও প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতিকে শাসন করে।

(গ) ভারতে ইংরেজের অধিকার রক্ষার প্রধান উপায়
(১) ভারতবাসীর উপর কঠিন অত্যাচার।
(২) ভারতবাসীর বুকে ইংরেজ জাতির গৌরব সর্বদা জাগিয়ে রাখা।
(৩) শাসনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয়দের নিয়োগ।

(ঘ) দীর্ঘসুপ্ত ভারতীয় জাতির ধীরে ধীরে বিনির হবার কারণ—
(১) দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা।
(২) দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও খাদ্যাভাব
(৩) বিজাতীয় পাশ্চাত্য ও প্রাচীন ভারতীয়দের ভাবের মধ্যে সংঘাত।

(ঙ) লেখকের মতে, ইংরেজের সিংহাসন এদেশে অচল—
(১) যতদিন ভারতীয়রা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন না হবে ততদিন।
(২) যতদিন ভারতীয়রা নানা প্রকার আচার ও নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ততদিন।
(৩) যতদিন ইংরেজের জাতীয় জীবন থেকে তাদের জাতিগত বিশেষ গুণগুলি লোপ না পায় ততদিন।

৩.৬ মূলপাঠ-২

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরুকতার

ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন, শর্তসূর্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা, অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী উদঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পুর্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ আধ্যাত্মিক কাহিনি. একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধন্যধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীনা বিদূষী নারীকুল, নতুন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতাসাবিত্রী, তপোবন জটাবল্কল, খাষায়, কৌপীন, সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্যে উদ্দেশ্য— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা— অর্থকরী বিদ্যা, উপায়— রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা— বেদ, উপায়— ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে— বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে।

‘ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথামিহ মানব তব সন্তোষঃ।।’

একদিকে নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন— পত্তিপত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব, অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন— বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগোচ্ছে ত্যাগ কর।

একদিকে নব্য ভারত বলিতেছেন— পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছেদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন— মূর্খ। অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন— পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন— বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ''যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। —(শিখিবার) আছে; কিন্তু ভয় ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এ-ও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্ত্য-অনুসরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি?

পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ংম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান, পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যের মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে; মূর্ত্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্ত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্ত্যের জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যের বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য— ইহার বিচার করিতেছি না ; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতি নীতির জঘন্যতার কারণ হয়; তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বর্ত্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্ত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলন্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্প্যানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগীজ, গ্রীক, ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দেন।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌবরচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটু লাগে— দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মন্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত। চতুর্দ্দশ শতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, তাহারা অনার্য্যজাতি। উহারা আর আমাদের নহে।।

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরামুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগণ সুখের জন্য নহে; ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না— নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, ''হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, অমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।''

৩.৭ সারাংশ-২

পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে এ দেশীয় ভাবধারার সংঘর্ষে ভারতবাসীর মনে এক নবচেতনার ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদয় হয়েছে। এমন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে যে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য যে অধ্যাত্মচিন্তা, তা আমাদের বর্তমান সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার কোনো সুযোগ দেয় না। অথচ আমাদের জীবনের অর্থ শুধু ভবিষ্যতের আশায় দিন গোনা নয়, বর্তমানকেও যথাযথরূপে উপলব্ধি করা, ভোগ করা। স্বাধীন চিন্তার ফলে ভারতবাসীর মনে নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে সংঘর্ষের চিন্তা আমাদের ভাবাতে চাইছে যে, পাশ্চাত্য জাতির চিন্তা ভাবনা, আচার-আচারণ শ্রেষ্ঠ এবং সেগুলিই আমাদের

মনেপ্রাণে গ্রহণ করা উচিত, তাতেই আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। অপরদিকে প্রাচীন ভারত ভারতবাসীকে নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চায়। লেখকের মতে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে যেমন আমাদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা দিয়েছে, তেমনি অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তাও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহে যেন স্বদেশকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখি, নিজেকে এদেশীয় বা ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা না পাই, ভারতবর্ষকে মনে-প্রাণে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেন এদেশের সঙ্গে সর্বপ্রকারে একাত্মতা অনুভব করতে পারি।

৩.৮ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

(১) নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি 'ঠিক' না 'ভুল' তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) আধুনিক ভারতীয়রা পতি-পত্নী নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষপাতী	☐	☐
(খ) অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব নিজের হয়	☐	☐
(গ) পাশ্চাত্যরা বাল্যবিবাহকে সমাজের মূল-ভিত্তি বলে জানে।	☐	☐
(ঘ) নব্য ভারত বলছে, পাশ্চাত্য জাতি যা করে তাই ভালো।	☐	☐
(ঙ) যে ব্যক্তি বা সমাজের শেখবার কিছু নেই তা মৃত।	☐	☐

(২) নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির জন্য ডানদিকে দেওয়া সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) লেখকের মতে, ভারতের উদ্দেশ্যে—
(১) ঐহিক সুখ
(২) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ
(৩) মুক্তি।

(খ) আধুনিক ভারত বলছে যে, পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় শক্তিশালী হতে হলে—
(১) দেশের জন্য আত্মত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার।
(২) পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছেদ গ্রহণ করা দরকার।
(৩) ভারতীয়দের দুর্ব্বলতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা দরকার।

(গ) রামকৃষ্ণ বলতেন—	(১) যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। (২) যতদিন শিখি ততদিন বাঁচি। (৩) বেঁচে থাকার অর্থই, নতুন কিছু শেখা।
(ঘ) পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হবে, কারণ—	(১) প্রাচ্য ভাবধারাতেই এদেশের অন্যান্য সকল সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত। (২) পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তাকে এদেশের সব সম্প্রদায়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে। (৩) পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।
(ঙ) ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষা মণ্ডিত দেখলে মনে হয়—	(১) ইউরোপীয় পোষাকের প্রতি তাদের বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে। (২) ওরা বুঝি দরিদ্রও বিদ্যাহীন ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকারে লজ্জিত। (৩) ইউরোপীয় প্রভাব এদেশে বেশ দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধেছে।

৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

(১) স্বামী বিবেকানন্দ : বিবেকানন্দ রচনাবলী।

একক ৩(১) ❑ তরুণের স্বপ্ন— সুভাষচন্দ্র বসু

৩(১).১ উদ্দেশ্য

৩(১).২ প্রস্তাবনা

৩(১).৩ সুভাষচন্দ্রের জীবন

৩(১).৪ মূলপাঠ

৩(১).৫ আলোচনা

৩(১).৬ সারাংশ

৩(১).৭ অনুশীলনী

৩(১).৮ সহায়ক গ্রন্থ

৩(১).১ উদ্দেশ্য

এই পাঠটি থেকে—দেশের তরুণদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

সুভাষচন্দ্র দেশের তরুণদের পরাধীনতার বেদনা কীভাবে বুঝিয়েছেন তা জানা যাবে। দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে তরুণের যৌবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করতেন সেকথা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যাবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত রচনা এটি।

৩(১).২ প্রস্তাবনা

আমাদের পাঠ্য ‘তরুণের স্বপ্ন’ ১৯২২ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সবুজপত্র’-য় লিখছেন, পরাধীনতার বেদনা লজ্জা অনুভব করছেন ও জাতির উন্নতি চাইছেন। অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ লেখকেরাও সাহিত্যরচনা করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ চাইছেন মানুষ সচেতন হোক তারা জাগ্রত হোক, প্রজাশক্তি নিজের অধিকার বুঝে নিক। একধাপ এগিয়ে সুভাষচন্দ্র চাইলেন, দেশের স্বাধীনতার পথে তরুণ সমাজ এগিয়ে আসুক কারণ তারাই পারে স্বপ্ন দেখতে এবং দেখাতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতায় যৌবনকে জয়টীকা পরানোর কথা ঘোষণা করেছেন। সবুজ যৌবনকে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র সেই স্বপ্ন তরুণদের মনে সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

৩(১).৩ সুভাষচন্দ্রের জীবন

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ও মাতা প্রভাবতী দেবী। প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুলে, পরে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৩ সালে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে ইংল্যান্ড থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ফেরেন, কিন্তু চাকরি না নিয়ে স্বদেশের কাজে ব্রতী হন। চিত্তরঞ্জন দাশ এ বিষয়ে তাঁর আদর্শ ছিলেন। ১৯২৫ সালে সুভাষচন্দ্র জেলে যান, পরে তাঁকে বার্মার মান্দালয়ে পাঠানো হয়, সেখানে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। সুভাষচন্দ্র দুবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং গান্ধীজির সঙ্গে মতাদর্শগত বিরোধের কারণে দুবারই পদত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালে তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। তিনি পালিয়ে আফগানিস্থান হয়ে জার্মানিতে যান সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৪৩-এ একটি জার্মান সাবমেরিনে করে জাপানে যান এবং রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রকে অর্পণ করেন। এরপর সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমা দখল করে। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি এখনও বিতর্কিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক' আখ্যা দিয়ে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন,—''স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।'' আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও সুভাষচন্দ্রের শৌর্য ও আপসহীন রণনীতি তাঁকে ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা দিয়েছে।

৩(১).৪ মূলপাঠ

তরুণের স্বপ্ন

সুভাষচন্দ্র বসু

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত— একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়— যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে— ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি। সকলক আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব— সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ— সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে— তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই, কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ,
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি— তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক, —আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে— সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নতুন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত— তাহারই উপাসক আমরা। আমরা জানিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি— অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ, এখানেই আমাদের গর্ব। যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও

লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্খার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি— বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ— আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা— সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই— সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা— যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা, হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি— সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি— জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি, — ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান— যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ— দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহন করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসংকেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মান করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরনীবক্ষেও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছি, আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা— তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে— তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের

রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন— এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

(১৯২২ সালের মে মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ)

৩(১).৫ আলোচনা

এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হয়, তখন সুভাষচন্দ্র পুরোপুরি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েননি। দেশের পরাধীনতার, বন্ধনের বেদনা তাঁকে মর্মে মর্মে পীড়া দিত এবং তার থেকে বেরিয়ে এই শ্যামল সুন্দর দেশে আনন্দের সঙ্গে মুক্ত জীবনাচরণের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং দেশের তরুণদেরও দেখিয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে বাঁচা যে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, সে সম্পর্কে সচেতনতা তিনি তরুণদের মধ্যে তৈরি করতে চেয়েছেন। ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সর্ব ক্ষেত্রে তরুণেরা সত্যের স্বাধীনতার, উদারতার আলোক নিয়ে আসবে এই তাঁর স্বপ্ন।

প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী ভাষায় দেশের মানুষকে ডাক দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের গাওয়া যৌবনের জয়গান সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর কোনো বিচার এখনো পর্যন্ত হয়নি। যদিও কয়েকটি প্রবন্ধ, অনেকগুলি ভাষণ, দুটি গ্রন্থ, ভারত পথিক (অনুবাদ) 'ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২,' আত্মজীবনী ইত্যাদি তিনি ইংরেজি ভাষায় তিনি রচনা করেছেন। আমাদের কাছে তিনি 'নেতাজী দেশনায়ক' বীর বিপ্লবী। সুভাষচন্দ্রের ভাষণ নাকি মন্ত্রের আকর্ষণের মত শ্রোতাদের মোহমুগ্ধ করে রাখত। এই স্বল্প পরিসরে সুভাষচন্দ্রের ভাষার সেই মোহময়ী শক্তি আমরা অনুভব করতে পারি। সহজ ও ওজস্বিনী ভাষায়, শস্যশ্যামলা বাংলার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ তিনি বর্ণনা করেছেন। মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ভাষায় তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাদের দেশব্রতে উৎসাহিত করে তুলেছেন। সাধুভাষায় লিখিত হলেও এই রচনার গদ্য স্বচ্ছন্দ, গতিশীল। যেমন, 'আমরা অনন্তপথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালোবাসি— অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "The right to make blunderness" অর্থাৎ ভুল করিবার অধিকার।' রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংগত কারণেই 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

৩(১).৬ সারাংশ

মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ধ্যানের দ্বারা, জীবনের

অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে তাদের যেতে হবে। যৌবনের পূর্ণ আনন্দ নিয়ে সে নিজে বাঁচবে ও অপরকে আনন্দিত করে তাদের রোগ, শোক, তাপ দূর করবে। যা কিছু সুন্দর, সত্য, মঙ্গলময় বস্তু আছে, নিজের জীবনে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে— আত্মদানের আনন্দ যে কী, তা তাকে জানতে হবে।

প্রতিকূল শক্তি, নৈরাশ্য, অবিশ্বাসের বাধা সরিয়ে, বার বার ভুল করেও অজানার উদ্দেশে তাকে পাড়ি দিতে হবে। যুবশক্তিই দেশে দেশে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য যুবশক্তিকে সর্বস্ব পণ করে দাঁড়াতেই হবে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা মানুষের কাম্য। সর্বদেশের ইতিহাসে যুবশক্তিই এই বন্ধমোচনের কাজে অগ্রসর হয়েছে। ভারতের যুবশক্তি এতদিন পর নিজেদের ধর্ম বুঝতে পেরেছে। তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভই এই নতুন যুগের আশা। পৃথিবীর সব দেশে তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বার্ধক্যের, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছে। ভারতের তরুণদেরও নিজেদের স্বপ্ন সফল করার জন্য জেগে উঠতে হবে।

৩(১).৭ অনুশীলনী

(ক)

(১) আমরা কি জন্য এ পৃথিবীতে এসেছি বলে লেখক বিশ্বাস করেন?

(২) যৌবনের কী কী ধর্ম সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন?

(৩) তরুণেরা বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে কী কী করেছে?

(৪) তরুণদের নবজাগরণের ফলে কী ঘটবে?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(১) যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে ________ ও ________ ।

(২) যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে _________ ও _________ আমাদের সহায় হয়।

(৩) আমরা ________ জল ________ এখানে আমি নাই।

(৪) এই যে তরুণের আন্দোলন এটা যেমন ________ তেমনি _________।

(৫) আমরা আনিয়া দিই _________ মধ্যে _________, জড়ের মধ্যে _________।

৩(১).৮ সহায়ক গ্রন্থ

(১) নেতাজী জন্মশতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ—১

একক ৪ ❑ বঙ্কুবাবুর বন্ধু — সত্যজিৎ রায়

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ মূলপাঠ

৪.৪ আলোচনা

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৪.১ উদ্দেশ্য

এখানে সাহিত্যের একটি নতুন শাখা 'কল্পবিজ্ঞান' এবং তার অন্তর্গত গ্রহান্তরের প্রাণী সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলকে শিক্ষার্থীদের অন্তরে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের কল্পনা ও বিজ্ঞান-সচেতনতার একগ্রাবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা, গ্রন্থান্তরের প্রাণী সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলাই এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ছোটগল্পের বৈচিত্র্যের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্পগুলি অনন্য সংযোজন। সত্যজিৎ রায়ের বেশির ভাগ কাহিনিতে অনেক বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, আলাদ করে ভূতের গল্প, রহস্য গল্প, সামাজিক গল্প বা কল্পবিজ্ঞান বলে কাউকে পুরোপুরি চিহ্নিত করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রথম আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর হাত ধরে। 'কুন্তলীন' পত্রিকায় কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য তিনি রুশদেশের কাহিনী বলে একটি গল্প প্রকাশ করেন এবং এটি প্রথম পুরস্কার পায় (১৮৯৬)। প্রায় সবসময়ে জগদানন্দ রায় লিখেছিলেন 'শুক্রভ্রমণ' যা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে আমরা পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তাঁর ঘনাদার গল্পে। অদ্রীশ বর্ধনও সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সমকালে কল্পবিজ্ঞানমূলক কাহিনী লিখেছেন।

বিদেশের সাহিত্যে জুল ভার্নকে সায়েন্স ফিকশনের জনক বলা হয়। তাঁর লেখায় তিনি ভবিষ্যতকালের পূর্বাভাস দিয়েছেন— যা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৭৫২ খ্রিঃ ভলতেয়ারের লেখা উপন্যাস 'মিক্রোমেগাস'-এ প্রথম গ্রহান্তরের প্রাণীর কথা বলা হয়। সত্যজিৎ রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এরিখ ভন

দানিকেনের লেখা 'চ্যরিয়েট অব দ্য গডস্' (দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ) এর দ্বারা—যেখানে ভিন্নগ্রহের উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীদের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতিসাধন হয়েছিল। এইচ জি ওয়েলস্ এবং আর্থার সি ক্লার্কও তাঁর সামনে ছিলেন।

৪.৩ মূলপাঠ

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনোদিন রাগতে দেখেনি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কীরকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, সেটা আন্দাজ করা ভারী শক্ত।

অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই না। আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল বা বাংলা পড়িয়ে আসছেন; এর মধ্যে কত ছাত্র এল-গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগা—ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর বসবার চেয়ারে গাবের আঠা মাখিয়ে রাখা, কালীপুজোর রাত্রে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া— এ সবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কখনও রাগেননি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন— ছিঃ।

এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, তিনি যদি রাগটাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তেদা তাঁর মতো গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর-একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর-একটা কারণ হল, ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটা করে ভাল ছাত্র প্রতিবারেই থাকে; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। এইসব ছাত্রদের তিনি কখনও কখনও নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের গল্প, এ সবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।

শনি-রবিবার সন্ধ্যেবেলাটা বঙ্কুবাবু যান গ্রামের উকিল শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায়। অনেকবার ভেবেছেন আর যাবেন না, এই শেষবার, আর না। কারণ ছাত্রদের টিটকিরি গা-সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে সেটা সত্যিই মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই তো সেদিন, দু' মাসও হয়নি, ভুতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সেদিন কী জানি হল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে, তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথা! এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছেতাই ভাবে নাজেহাল হতে হল। মিত্তিরদের তেঁতুলগাছটার তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভুসোটুসো মেখে অন্ধকারে তাঁর পিঠের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারও চক্রান্ত আর কি!

ভয় অবিশ্যি পাননি বঙ্কুবাবু। তবে চোট লেগেছিল। তিনদিন ঘাড়ে ব্যথা ছিল। আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রি— তাঁর নতুন পাঞ্জাবিটা কালিটালি লেগে ছিঁড়েটিঁড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার এ কী রকম রে বাপু।

এ ছাড়া ছোটখাটো পিছনে লাগার ব্যাপার তো লেগেই আছে। এই যেমন ছাতাটা জুতোটা লুকিয়ে রাখা, পানে আসল মশলার বদলে মাটির মশালা দেওয়া, জোর করে ধরে বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু তাও আড্ডায় আসতে হয়। না হলে শ্রীপতিবাবু কী ভাববেন। একে তো তিনি গাঁয়ের গণ্যমান্য লোক, দিনকে রাত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর, তার উপরে আবার তাঁর বঙ্কুবাবু না হলে চলেই না। তিনি বলেন, একজন থাকবে যাকে নিয়ে বেশ রসিয়ে রগড় করা চলবে, নইলে আর আড্ডা। ডাকো বঙ্কুবিহারিকে।

আজকের আড্ডার সুর ছিল উচ্চগ্রামের; অর্থাৎ স্যাটেলাইট নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজই সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের আকাশে একটি চলন্ত আলো দেখা গেছে। মাসতিনেক আগে একবার ওইরকম আলো দেখা গিয়েছিল এবং তাই নিয়ে আড্ডায় বিস্তর গবেষণআ চলেছিল। পরে জানা যায় ওটা একটা রাশিয়ান স্যাটেলাইট। খটকা না ফোসকা এই গোছের কী একটা নাম। সেটা নাকি ৪০০ মাইল ওপর দিয়ে বনবন করে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে এবং তার থেকে নাকি বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন।

আজকের আলোটা বঙ্কুবাবু প্রথম দেখেছিলেন। তারপর তিনিই সেটা নিধু মোক্তারকে ডেকে দেখান।

কিন্তু আড্ডায় এসে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে, নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিছু বললেন না।

স্যাটেলাইট সম্বন্ধে এখানে কেউ বিশেষ কিছু জানেন না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকিট লাগে না, বা বললে পুলিশেও ধরে না, তাই সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন, 'যাই বলো বাপু, এসব স্যাটেলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামোখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই। কোথায় আকাশের কোন কোণে আলোর ফুলকি দেখেছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজ লিখছে, আর তাই লড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে বাহবা দিচ্ছ। যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঁ।'

রামকানাই-এর বয়সটা কম। সে বলল, 'আমার না হোক, মানুষের তো। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

চণ্ডীবাবু বললেন, 'রাখো রাখো। যতসব মানুষ না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটেলাইট? মানুষ ছাড়া আর আছে কী?

নিধু মোক্তার বললেন, 'আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোকটোক নেই, কেবল একটা যন্ত্র পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে। যাকগে। কিন্তু রকেট? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয় ভায়া।'

চণ্ডীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, 'রকেট! রকেট ধুয়ে কোন জলটা খাবে শুনি? রকেট। তাও বুঝতাম যদি হ্যাঁ, এই আমাদের দেশেই তৈরি হল, গড়ের মাঠ থেকে ছাড়লে সেটা চাঁটে টাদে তাগ করে, আমরা গিয়ে টিকিট কিনে দেখে এলুম, তাও একটা মানে হয়।'

রামকানাই বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।'

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন, 'ধরো যদি অন্য গ্রহ-ট্রহ থেকে কিছু পৃথিবীতে এল....'

'এলেই বা কী? তুমি-আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।'

'তা বটে।'

আড্ডার সবাই চায়ে পেয়ালায় মুখ দিলেন। এর পর তো আর কথা চলে না।

এই অবসরে বঙ্কুবাবু খুক করে একটু কেশে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরুন যদি এইখানেই আসে।'

নিধুবাবু অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাঁকা আবার কী বলছে হে, অ্যাঁ? কে আসবে এইখানে? কোত্থেকে আসবে?'

বঙ্কুবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোনও লোক-টোক....'

ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমতো বঙ্কুবাবুর পিঠে একটা অভয় চাপড় মেরে দাঁত বার করে বললেন, 'বাঃ বঙ্কুবিহারী, বাঃ। অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে এইখানে? এই গণ্ডগ্রামে? লন্ডন নয়, মস্কো নয়, নিউ ইয়র্ক নয়, মায় কলকেতাও নয়— একেবারে এই কাঁকুড়গাছি? তোমার তো শখ কম নয়।'

বঙ্কুবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন বলতে লাগল, সেটা আর এমন অসম্ভব কী? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তো পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি হিসেব করে না-ই আসে? কাঁকুড়গাছিতে না-আসা যেমন সম্ভব, আসাও তো ঠিক তেমনই সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ, কিছু বলেননি। এবার তিনি নড়েচড়ে বসতেই সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিজ্ঞের মতো ভারী গলায় বললেন, 'দেখো, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসেই, তবে এটা জেনে রেখো যে তারা এই পোড়া দেশে আসবে না। তাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আর অত বোকা তারা নয়। আমার বিশ্বাস তারা সাহেব, এবং এসে নামবে ওই সাহেবদেরই দেশে পশ্চিমে। বুঝেছ?'

এ-কথায় এক বঙ্কুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন।

চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে, বঙ্কু ঠিকই বলেছেন। বঙ্কুবিহারীর মতো লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কী বলো নিধু? ধরো যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তা হলে বঙ্কুর মতো দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি?'

নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বলো, চেহারা বলো, যাই বলো, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'

রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মতো। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'

বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম? ওই তো শ্রীপতিবাবু— উটের মতো থুতনি। আর ওই ভৈরব চক্কোত্তি— কচ্ছপের মতো চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু— চামচিকা। চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো.....

বঙ্কুবাবুর চোখে জল এল। তিনি উঠে পড়লেন। আজ অন্তত আড্ডাটা ভাল লাগবে ভেবেছিলেন। হল না। মনটা ভারী হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না!

'সে কী, উঠলে নাকি হে?' শ্রীপতিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যা রাত হল।'

'কই রাত? কাল তো ছুটি। বোসো, চা খাও।'

'নাঃ। আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।'

রামকানাই বলল, 'দেখবেন বঙ্কুদা। আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলবার। মানুষ কিন্তু ভুতেরও বাড়া।'

বঙ্কুবাবু আলোটা দেখতে পেলেন পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের মাঝবরাবর এসে। তাঁর নিজের হাতে আলো ছিল না। শীতকলা, তাই সাপের ভয় নেই; তা ছাড়া পথও খুব ভাল ভাবেই চেনা। এ পথে এমনিতে বড় একটা কেউ আসে না, কিন্তু বঙ্কুবাবুর শর্টকাট হয় বলেই তিনি এই পথে যান।

কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর কেমন জানি খটকা লাগছিল। অন্যদিনের চেয়ে কী জানি একটা অন্যরকম ভাব। কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হল যে, বাঁশবনে আজ ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে না। একদম না। সেইটেই তফাত। অন্যদিন যতই বনের ভিতর ঢোকেন ততই ঝিঁঝির ডাক বাড়ে। আজ ঠিক তাঁর উল্টো। তাই এমন থমথমে ভাব। ব্যাপার কী? ঝিঁঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে হাত বিশেক গিয়ে পুব দিকে চোখ যেতেই আলোটা দেখতে পেলেন।

প্রথমে মনে হল বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যিখানের ফাঁকটায় যেখানে ডোবাটা রয়েছে তার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছের ডালে ও পাতায় একটা গোলাপি আভা। আর নীচে, ডোবার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উজ্জ্বল গোলাপি আলো। কিন্তু আগুন নয়, কারণ আলোটা স্থির।

বঙ্কুবাবু এগোতে লাগলেন।

কানের মধ্যে একটা শব্দ আসছে। কিন্তু সেটা যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। হঠাৎ কানে তালা লাগলে যেমন শব্দ হয়— রী রী রী রী— এ যেন ঠিক সেইরকম।

বঙ্কুবাবুর গা একটু ছমঠম করে থাকলেও, একটা অদম্য কৌতূহলবশে তিনি এগিয়ে চললেন।

ডোবার থেকে ত্রিশ হাত দূরে বড় বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি জিনিসটা দেখতে পেলেন। একটা অতিকায় উপুড় করা কাচের বাটির মতো জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছাদন করে পড়ে আছে এবং তার প্রায় স্বচ্ছ ছাউনির ভিতর থেকে একটা তীব্র অথচ স্নিগ্ধ গোলাপি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকের বনকে আলো করে দিয়েছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও কখনও দেখেননি।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বঙ্কুবাবু লক্ষ করলেন যে, জিনিসটা স্থির হলেও যেন নির্জীব নয়। অল্প অল্প স্পন্দনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে-নামে, কাচের ঢিবিটা তেমনই উঠছে নামছে।

বঙ্কুবাবু ভাল করে দেখবার জন্য আর হাত চারেক এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তাঁর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর হাত-পা যেন কোনও অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। তিনি না পারেন এগোতে, না পারেন পিছোতে।

কিছুক্ষণ এইভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে, জিনিসটার স্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই অদ্ভুত কানে তালা লাগার শব্দটা। তারপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, কতকটা মানুষের মতো কিন্তু অত্যন্ত মিহি গলায় চিৎকার এল— মিলিপিপ্লিং খুক, মিলিপিপ্লিং খুক।

বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ। এ আবার কী ভাষা রে বাবা। আর যে বলছে সেই-বা কোথায়?

দ্বিতীয় চিৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'হু আর ইউ? হু আর ইউ?'

এ যে ইংরেজি। হয়তো তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে প্রশ্নটা।

বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার— বঙ্কুবিহারী দত্ত।'

প্রশ্ন এল, 'আর ইউ ইংলিশ? আর ইউ ইংলিশ?'

বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, নো স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার।'

একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'

বঙ্কুবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'নমস্কার।' বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করলেন যে, তাঁর হাত-পায়ের অদৃশ্য বাঁধনগুলো যেন আপনা থেকেই আলাগ হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলেই পালাতে পারেন, কিন্তু পালালেন না। কারণ তিনি দেখলেন, সেই অতিকায় কাচের ঢিবির একটা অংশ আস্তে আস্তে দরজার মতো খুলে যাচ্ছে।

সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রথমে একটা মসৃণ বলের মতো মাথা, তারপর একটা অদ্ভুত প্রাণীর সমস্ত শরীরটা।

লিকলিকে শরীরের মাথা বাদে সমস্তটাই একটা চকচকে গোলাপি পোশাকে ঢাকা।

মুখের মধ্যে কান ও নাকের জায়গায় দুটো করে এবং ঠোঁটের জায়গায় একটা ফুটো। লোম বা চুলের লেশমাত্র নেই। হলদে গোলগাল চোখদুটো এমনই উজ্জ্বল যে, দেখলে মনে হয় আলো জ্বলছে।

লোকটা আস্তে আস্তে বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর তিন হাত দূরে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। বঙ্কুবাবুর হাতদুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল।

প্রায় এক মিনিট দেখার পর লোকটা সেইরকম বাঁশির মতো মিহি গলায় বলল, 'তুমি মানুষ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

লোকটা বলল, 'এটা পৃথিবী?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'ঠিক ধরেছি— যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটা সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথমে প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম। যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না তখন বুঝতে পারলাম যে, পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পণ্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূরে এসে। আরেকবার এরকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কি, হেঃ হেঃ হেঃ।'

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তা ছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।

টেপা শেষ করে লোকটা বলল, 'আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।'

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী? বললেই হল? বঙ্কুবাবুর হাসি পেল।

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল। সে বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই! প্রমাণ আছে। ....তুমি ক'টা ভাষা জানো?'

বঙ্কুবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে.... হিন্দিটা.... মানে....'

'মানে আড়াইটে।'

'হ্যাঁ....'

'আমি জানি চোদ্দো হাজার। তোমাদের সৌরজগতের এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তা ছাড়া আরও একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি নিজে গিয়েছি। তোমার বয়স কত?'

'পঞ্চাশ।'

'আমার আটশো তেত্রিশ। তুমি জানোয়ার খাও?'

বঙ্কুবাবু এই সেদিন কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছেন— না বলেন কী করে।

অ্যাং বলল, 'আমরা খাই না। বেশ কয়েকশো বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম। হয়তো তোমাকেও খেতাম।'

বঙ্কুবাবু ঢোক গিললেন।

'এই জিনিসটা দেখেছ?'

অ্যাং একটা নুড়িপাথরের মতো ছোট জিনিস বঙ্কুবাবুর হাতে দিল। সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরণ খেলে গেল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিয়ে এলেন।

অ্যাং হেসে বলল, 'এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পারোনি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মতো এমন জিনিস আর নেই।'

বঙ্কুবাবু এবার সত্যিই অবাক হতে শুরু করেছেন।

অ্যাং বলল, 'এমন কোনও জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না?'

বঙ্কুবাবু ভাবলেন, সারা পৃথিবীটাই তো দেখা বাকি। ভুগোল পড়ান, অথচ বাংলাদেশের গুটিকতক গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কী দেখেছেন তিনি? বাংলাদেশেরই বা কী দেখেছেন? হিমালয়ের বরফ দেখেননি, দিঘার সমুদ্র দেখেননি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেননি, এমনকী শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেননি।

মুখে বললেন, 'অনেক কিছু তো দেখিনি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

অ্যাং একটা ছোট কাচ-লাগানো নল বার করে বঙ্কুবাবুর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এইটেয় চোখ লাগাও।'

চোখ লাগাতেই বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এও কী সম্ভব? তাঁর চোখের সামনে ধূ-ধূ করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের মতো এক-একটা বরফের চাঁই। উপরে গাঢ় নীল আকাশে রামধনুর রঙে রঙিন বিচিত্র নকশা সব ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাচ্ছে— অরোরা বোরিয়ালিস। ওটা কী? ইগলু! ওই পোলার বিয়ারের সারি। ওই পেঙ্গুইনের দল। ওটা কোন বীভৎস জানোয়ার? ভাল করে দেখে বঙ্কু চিনলেন— সিন্ধুঘোটক। একটা নয়, দুটো— প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুলোর মতো জোড়া দাঁত একটা আর-একটার গায়ে বসিয়ে দিল। শুভ্র বরফের গায়ে লাল রক্তের স্রোত।....

পৌষ মাসের শীতে বরফের দৃশ্য দেখে বঙ্কুবাবুর ঘাম ঝরতে শুরু করল।

অ্যাং বলল, 'ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না?'

বঙ্কুবাবুর মনে পড়ে গেল— সেই মাংসখেকো পিরান্‌হা মাছ। আশ্চর্য। লোকটা তাঁর মনের কথা টের পায় কী করে?

বঙ্কুবাবু আবার চোখ লাগালেন।

গভীর জঙ্গল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ইতস্তত রোদের ছিটেফোঁটা, একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছ, তা থেকে ঝুলছে ওটা কী? সর্বনাশ! এতবড় সাপ বঙ্কুবাবু জীবনে কখনও কল্পনা করতে পারেননি। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছেন ব্রেজিলের অ্যানাকোন্ডা। অজগরের বাবা। কিন্তু মাছ কই? ওই যে একটা খাল। দু'পাশে ডাঙায় কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। সার সার কুমির— তার একটা নড়ে ওঠে। জলে নামবে। ওই নেমে গেল সড়াত— বঙ্কুবাবু যেন শব্দটাও শুনতে পেলন। কিন্তু এ কী ব্যাপার? কুমিরটা এমন বিদ্যুদ্বেগে জল ছেড়ে উঠে এল! কেন? কিন্তু এ কি সেই একই কুমির? বঙ্কুবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে, কুমিরটার তলার অংশটায় মাংস বলে প্রায় কিছুই নেই, খালি হাড়। আর শরীরের বাকি অংশটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে পাঁচটি দাঁতালো রাক্ষুসে মাছ। পিরান্‌হা মাছ!

বঙ্কুবাবু আর দেখতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

অ্যাং বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় আমরা শ্রেষ্ঠ?'

বঙ্কুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'তা তো বটেই! নিশ্চয়ই। বিলক্ষণ। একশোবার।'

অ্যাং বলল, 'বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করোনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোনও প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়েই ভালই লাগল। তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব—'

বঙ্কুবাবুর কথা আর শেষ হল না, চক্ষের পলকে কখন যে অ্যাং রকেটে উঠে পড়ল এবং কখন যে সেই রকেট পঞ্চা ঘোষের বাঁশবন ছেড়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা যেন বঙ্কুবাবু টেরই পেলেন না। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, আবার ঝিঁঝিঁ ডাকতে শুরু করেছে। রাত হয়ে গেল অনেক।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বঙ্কুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন। কতবড় একটা ঘটনা যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। কোথাকার কোন সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনেনি, তারই একজন লোক— লোক তো নয়, অ্যাং— তার সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! সারা পৃথিবীতে আর কারও সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

পরদিন রবিবার। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা। কালকের আলোর খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে, তবে নেহাতই নগণ্যের পর্যায়ে। বাংলাদেশের মাত্র দু-একটা জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাবার খবর এসেছে। তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মতো গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আজ পঞ্চা ঘোষ আড্ডায় এসেছেন। তাঁর চল্লিশ বিঘের বাঁশবনের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের দশটা বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে। শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এইভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব চক্কোত্তি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ বঙ্কুর দেরি কেন?'

তাই তো, এতক্ষণ কারও খেয়াল হয়নি।

নিধু মোক্তার বললেন, 'ব্যাঁকা কি আর সহজে এ-মুখো হবে? কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে!'

শ্রীপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে কেন? বঙ্কুকে যে চাই। রামকানাই, তুমি একবার যাও তো দেখি ধরে নিয়ে আসতে পারো কিনা।'

রামকানাই 'চা-টা খেয়েই যাচ্ছি' বলে সবে পেয়ালায় চুমুক দিতে গেছে এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটখাটো বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে থমথমিয়ে দিল।

তারপরে ঝড়ের খেলা। প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন— সে হাসি এর আগে কেউ কোনওদিন শোনেনি, তিনি নিজেও শোনেননি।

তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, ''বন্ধুগণ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন। আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা। এক নম্বর— সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে— আপনারা সবাই বড্ড বাজে বকেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে। দুই নম্বর— এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি— আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষি। দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। নিধুবাবু, আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে। আর শ্রীপতিবাবু— আপনি গন্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বইকী! কিন্তু জেনে রাখুন যে, আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই; যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি— ভাল পা চাটতে পারে।.... ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি— আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি— কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। লোকটি— থুড়ি, অ্যাংটি— ভারী ভাল।"

এই বলে বঙ্কুবাবু তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ভৈরব চক্কোত্তির পিঠে একটা চাপড় মেরে বিষম খাইয়ে সদর্পে শ্রীপতিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রামকানাই-এর হাত থেকে চা-ভর্তি পেয়ালাটা পড়ে গিয়ে সব্বাই-এর কাপড়-চোপড়ে গরম চা ছিটিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

৪.৪ আলোচনা

বঙ্কুবাবু একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ গল্পেই এমন একজন মানুষকে পাওয়া যায়। বঙ্কুবাবু বিবাহ করেননি— আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল ও নন। তিনি সৎ, ভালোমানুষ এবং কল্পনাপ্রবণ। ভূগোল তাঁকে আকর্ষণ করে, কল্পনায় পৃথিবীর বিখ্যাত স্থানগুলি তিনি পরিক্রমা করেন। ছাত্রপ্রীতি তাঁর

মানসিক সম্পদ। ভালো ছাত্র খুঁজে বার করে তাদের মধ্যে তিনি জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে চান। এই ধরনের চরিত্রকে সত্যজিৎ রায় হঠাৎ কোনো অপরিচিত অসম্ভব স্থানে নিয়ে যান বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন করেন। চিরপরিচিত বাঁশবাগানের রাস্তায় একটি মহাকাশ যানের উপস্থিতি এই রকমই একটা ব্যাপার। তবে, কল্পবিজ্ঞানের কিছু কিছু গ্রহান্তরবাসীর মত ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং নিষ্ঠুর নয়। বঙ্কুবাবুর প্রতি সে দানিকেনের গ্রহান্তরে মানুষের মত বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন পরিবর্তিত মানুষে পরিণত করে। বস্তুত অ্যাং-ই বঙ্কুবাবুর প্রকৃত বন্ধু যে বঙ্কুবাবুর মধ্যে আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলেছে। তথাকথিত বন্ধুদের বঙ্কুবাবু ত্যাগ করেছেন।

শুধু সায়েন্স ফিকশন বললে গল্পটির সবকথা বলা হয় না। সামাজিক জীবনে নিরীহ লোকেদের ক্ষেত্রে যা নিত্যই ঘটে এখানে ঠিক তাই ঘটেছে। নিরীহ লোকের প্রতি মজা করার প্রবণতা—যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের প্রতি কতখানি অপমানজনক, সেই মনস্তত্ত্ব লেখক উন্মোচন করেছেন। লোকচরিত্রজ্ঞানের এই অভিজ্ঞতাকে লেখক কাজে লাগিয়েছেন।

৪.৫ সারাংশ

সত্যজিৎ রায়ের উদ্দিষ্ট পাঠক শিশু, কিশোর, তিনি নিজেও সেটা জানতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সাহিত্য আর কোথায় রচনা করলাম, আমি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তো বিশেষ কিছুই লিখিনি।' (দেশ—১৯৮৭)। আর এজন্যই তাঁর গল্পে ভায়োলেন্স নেই। লীলা মজুমদার সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন : 'আমরা কেউ ভাবতেই পারি নি যে, ওর মধ্যে এমন একজন গুণী গল্পকার রয়েছে। আর একবার শুরু হলে তার উৎস থেকে ঝরণার জল যেমন অবিরাম ধারায় বইতে থাকে, তেমনি হল। একটির পর একটি অপূর্ব গল্প লেখা হতে থাকল। নানারকমের, নানারসের গল্প। প্রায় প্রত্যেকটিই ৬ থেকে ৯০ বছরের পাঠক-পাঠিকারা উপভোগ করবে।'

(সন্দেশ : সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা— ১৯৯২)

বঙ্কুবিরী দত্ত একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। কাঁকুড়গাছি প্রাইমারী স্কুলে তিনি ভূগোল ও বাংলা পড়ান। এই কাজ তিনি ২২ বছর ধরে করে আসছেন। তিনি ভালো ছেলেদের বাড়িতে ডেকে মুড়কি খাওয়ান এবং দেশ বিদেশের গল্প শোনান। ছাত্ররা তাঁকে নিরীহ, ভালো মানুষ পেয়ে নানাভাবে হেনস্থা করলেও তিনি কিছু বলেন না। শনি-রবিবার বিত্তশালী শ্রীপতিবাবুর বাড়ির আড্ডাতে যান, ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে যেতে হয়। সেখানে তাঁকে নিয়ে অনেকেই মজা করে এবং সেটা অপমানের পর্যায়ে চলে গেলেও তিনি কিছু বলতে পারেন না।

অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন আড্ডা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাঁশবাগানে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে একটি গ্রহান্তরের প্রাণীর দেখা হয় যে ভুল করে প্লুটোর বদলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। এই অ্যাং নামক

ক্রেনিয়াস গ্রহের প্রাণীটি তাঁকে ভালোভাবে জরিপ করে বোঝে যে বঙ্কুবাবু নেহাৎই ভালোমানুষ এবং ব্যক্তিত্বহীন। অ্যাং তাকে সাহসী হতে, প্রতিবাদ করতে শেখায়।

পরের দিন আড্ডায় গিয়ে বঙ্কুবাবু বলেন যে, তিনি আর আড্ডায় যোগ দেবেন না। তাঁর প্রতি অবহেলা ও অপমানের যোগ্য জবাব দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসেন।

৪.৬ অনুশীলনী

(১) (ক) বঙ্কুবাবু কী করতেন?

(খ) বঙ্কুবাবুর স্বপ্ন কী ছিল?

(গ) বঙ্কুবাবুর বন্ধুদের নাম কী কী ছিল?

(ঘ) কেন বঙ্কুবাবু আড্ডায় যেতেন?

(ঙ) গ্রহান্তরের প্রাণীটির নাম ও তার দেশের নাম বলুন।

(২) অশুদ্ধি সংশোধন করুন :

ইস্কুল, দুষ্টু, শনি, মনি, নমস্কার, মসৃণ।

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থ

(১) বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান

(২) সত্যজিৎ রচনারহস্য

(৩) ফেলুদা সমগ্র (১)—আনন্দ পাবলিশার্স